নভেম্বর ২০২১ ■ কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪২৮

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

তেসরা নভেম্বর জেল হত্যা দিবস

বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতা

হেমন্ত

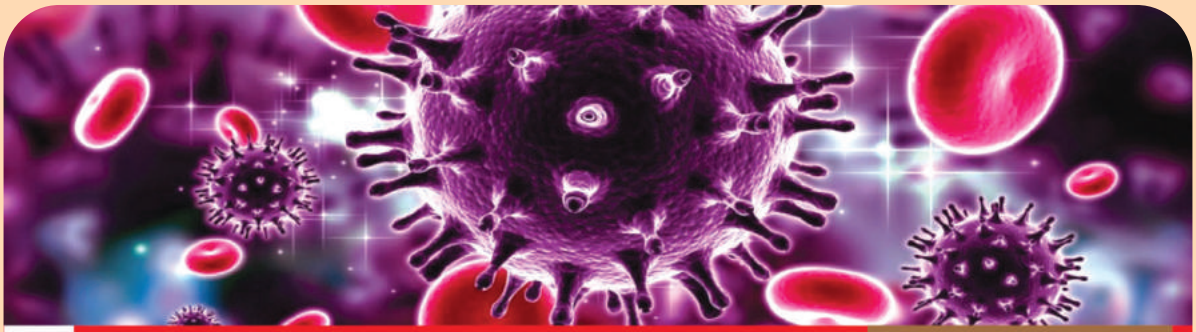

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয়

- বিনা প্রয়োজনে বাসা থেকে বের হবেন না।
- যেখানে সেখানে কফ বা থুথু ফেলবেন না।
- হ্যান্ডশেক বা কোলাকুলি করা থেকে বিরত থাকুন।
- পরিষ্কার করে হাত না ধুয়ে চোখ, মুখ, নাক স্পর্শ করবেন না।
- কিছুক্ষণ পর পর সাবান বা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুয়ে ফেলুন।
- হাঁচি, কাশির সময় রুমাল বা টিস্যু দিয়ে অথবা কনুই-এর ভাঁজে মুখ ঢেকে ফেলুন। ব্যবহার করা রুমাল ও টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লার বাক্সে ফেলে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করুন।
- জনবহুল স্থান ও গণপরিবহন এড়িয়ে চলুন ; অন্যথায় মাস্ক ব্যবহার করুন।
- বাসায় ফিরে পরিধানের কাপড় ও হাত সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। সম্ভব হলে গোসল করুন।
- বিদেশ থেকে আসা ব্যক্তিরা নিজের, পরিবারের, প্রতিবেশীর বা দেশের স্বার্থে ১৪ দিনের জন্য কোয়ারেন্টাইন বা সঙ্গনিরোধে থাকুন। অন্যথায় এ রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে।
- হঠ্যাৎ জ্বর, কাশি বা গলাব্যাথা হলে বা কোয়ারেন্টাইনে থাকা অবস্থায় অসুস্থবোধ করলে স্থানীয় সিভিল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা অথবা নিচের নম্বরে যোগাযোগ করুন ; সরকারি তথ্য সেবা নম্বর- ৩৩৩, স্বাস্থ্য বাতায়ন- ১৬২৬৩, আইইডিসিআর- ০১৯৪৪৩৩৩২২২(হান্টিং নম্বর)।

গুজবে কান দেবেন না। আতঙ্কিত না হয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ মেনে চলুন, সংক্রমণ প্রতিরোধে সহযোগিতা করুন।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

নভেম্বর ২০২১ ❑ কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪২৮

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৮ই অক্টোবর 'শেখ রাসেল দিবস-২০২১' উপলক্ষে স্মারক ডাকটিকিট, উদ্‌বোধনী খাম এবং সিলমোহর অবমুক্ত করেন– পিআইডি

সম্পাদকীয়

তেসরা নভেম্বর জেল হত্যা দিবস। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। স্বাধীনতার পরাজিত শক্তি ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। দেশি-বিদেশি চক্রের সহায়তায় তারা ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বর্বরোচিতভাবে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার হত্যা করে। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৭৫ সালের তেসরা নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে সংঘটিত হয় ইতিহাসের আরেকটি বর্বর হত্যাকাণ্ড। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর বাংলাদেশ যাতে ঘুরে দাঁড়াতে না পারে সেজন্য ঘাতকচক্র বঙ্গবন্ধুর আজীবন রাজনৈতিক সহকর্মী জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এএইচএম কামারুজ্জামান এবং ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলীকে জেলখানায় নির্মমভাবে হত্যা করে। জেল হত্যা দিবসে জাতীয় চার নেতার প্রতি রইল বিনম্র শ্রদ্ধা। জেল হত্যা দিবসকে উপলক্ষ করে *সচিত্র বাংলাদেশ*-এ রয়েছে– প্রবন্ধ ও নিবন্ধ।

১৩ই নভেম্বর ১৯৪৮ সালে জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ জন্মগ্রহণ করেন নেত্রকোণার মোহনগঞ্জে। তিনি ছিলেন একাধারে ঔপন্যাসিক, ছোটোগল্পকার, নাট্যকার, গীতিকার, চলচ্চিত্র নির্মাতা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তাঁকে নিয়ে এ সংখ্যায় রয়েছে নিবন্ধ।

১৪ই নভেম্বর বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস। আন্তর্জাতিক ডায়াবেটিস ফেডারেশন ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ১৯৯১ সাল থেকে এই দিনকে বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস হিসেবে পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রতিবছর বাংলাদেশসহ প্রায় ১৭০টি দেশে এ দিবসটি পালিত হয়। ডায়াবেটিস দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য– Access to Diabetes Care. If not now, when? ডায়াবেটিস দিবস উপলক্ষে এ সংখ্যায় রয়েছে নিবন্ধ।

বাংলাদেশ ষড়ঋতুর দেশ। ছয়টি ঋতু নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়ে নানা বৈচিত্র্যে পর্যায়ক্রমে আবির্ভূত হয়। চতুর্থ ঋতু হেমন্তকাল। হেমন্তকালে সোনালি ধানে মাঠ ভরে ওঠে। এ সময় চাষিরা নতুন ধান ঘরে তোলে। ঘরে ঘরে হয় নবান্ন উৎসব। হেমন্তকাল নিয়ে এ সংখ্যায় রয়েছে কবিতা।

এছাড়া অন্যান্য নিবন্ধ ও নিয়মিত বিষয় নিয়ে সাজানো হয়েছে *সচিত্র বাংলাদেশ* নভেম্বর ২০২১ সংখ্যা। আশা করি, সংখ্যাটি পাঠকদের ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
হাছিনা আক্তার

সম্পাদক
ডায়ানা ইসলাম সিমা

কপি রাইটার
মিতা খান

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

অলংকরণ : নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৯৭
e-mail : editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

সূচিপত্র

প্রবন্ধ/নিবন্ধ/সাক্ষাৎকার

বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতা ৪
প্রফেসর ড. মো. মাহবুবর রহমান

বঙ্গবন্ধুর সাহসিকতা ৭
প্রফেসর ড. সরকার আবদুল মান্নান

জেল হত্যাকাণ্ড: কলঙ্কিত পঁচাত্তর এবং ইতিহাসের দায় শোধ ১২
মুস্তাফা মাসুদ

জেল হত্যা: বঙ্গবন্ধুর আদর্শের নেতৃত্বকে নিশ্চিহ্ন করার অপচেষ্টা ১৫
মো. মামুন অর রশিদ

সুবর্ণ জয়ন্তীর প্রত্যয়-প্রত্যাশা ১৭
অধ্যাপক গাজী আজিজুর রহমান

বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণের সৌন্দর্য মীমাংসা ১৯
প্রফেসর নৃপেন্দ্রলাল দাশ

বঙ্গবন্ধু ও সংবিধানের পূর্বাপর ২১
খান চমন-ই-এলাহি

পঞ্চাশ বছরে বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ ২৪
সাহিদা বেগম

বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্ব ও দূরদর্শিতা ২৫
ড. মোহাম্মদ হাসান খান

অবিনাশী জয় বাংলা ২৭
শ্যামল কুমার সরকার

সবুজায়ন ঢাকার বিকল্প নেই ২৮
আলী হাসান

লুৎফর রহমানের ক্যামেরায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ৩০
আপন চৌধুরী

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়: বাংলা ভাষার একনিষ্ঠ সাধক ৩২
ইফ্‌ফাত আরা দোলা

শুভ জন্মদিন প্রিয় হুমায়ূন আহমেদ ৩৪
মঈনুল হক চৌধুরী

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন ও বর্তমান সরকার ৩৫
শারমিন ইসলাম

ডায়াবেটিস: প্রয়োজন সচেতনতা ও নিয়ন্ত্রণ ৩৭
ডা. নাজনীন নাওয়াল (বিপাশা)

নিউমোনিয়ায় শিশুমৃত্যু রোধে সরকারের কার্যক্রম ৩৯
ফারিয়া মরিয়ম

গল্প

গ্রামের লক্ষ্মী সুমিতা ৪১
মোহাম্মদ নজরুল হাসান ছোটন

কবিতাগুচ্ছ ৪৩-৪৬
তাহমিনা কোরাইশী, সাইফুল ইসলাম জুয়েল, আমিরুল হক, আবু তৈয়ব মুছা, রুহুল গনি জ্যোতি, নিজামউদ্দীন মুন্সী, জব্বার আল নাঈম, রুস্তম আলী, তারিকুল আমিন, আসাদ আহমেদ, মনির জামান, কাব্য কবির, মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ, আব্দুল আউয়াল রণী, আবীর আহমেদ উল্যাহ, এস এম শহীদুল আলম, শাহজাহান মোহাম্মদ

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি	৪৭
প্রধানমন্ত্রী	৪৮
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	৪৯
আন্তর্জাতিক	৫০
উন্নয়ন	৫০
ডিজিটাল বাংলাদেশ	৫১
শিল্প-বাণিজ্য	৫১
শিক্ষা	৫২
বিনিয়োগ	৫২
নারী	৫৩
সামাজিক নিরাপত্তা	৫৪
কৃষি	৫৪
পরিবেশ ও জলবায়ু	৫৫
বিদ্যুৎ	৫৬
নিরাপদ সড়ক	৫৭
স্বাস্থ্যকথা	৫৭
যোগাযোগ	৫৮
কর্মসংস্থান	৫৮
সংস্কৃতি	৫৯
চলচ্চিত্র	৬০
মাদক প্রতিরোধ	৬০
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী	৬১
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন	৬১
প্রতিবন্ধী	৬২
ক্রীড়া	৬৩

শ্রদ্ধাঞ্জলি: চলে গেলেন নাট্যব্যক্তিত্ব ড. ইনামুল হক ৬৪

সিরাজগঞ্জ কাজিপুর ডাকবাংলোর সামনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জাতীয় চার নেতার ভাস্কর্য

পনেরো আগস্টের অসমাপ্ত হত্যাকাণ্ড তেসরা নভেম্বর

১৯৭৫ সালের পনেরোই আগস্ট সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবার হত্যার তিন মাসের মধ্যেই ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্তে আরও একবার রক্তে রঞ্জিত হয় বাংলাদেশ। তেসরা নভেম্বর সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এএইচএম কামারুজ্জামান ও ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নির্মম হত্যার শিকার হন। ষড়যন্ত্রকারীদের কাছে তেসরা নভেম্বর ছিল মূলত পনেরোই আগস্টের অসমাপ্ত হত্যাকাণ্ড।

১৯৭১ সালের ছাব্বিশে মার্চের প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণার পরপরই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক গ্রেপ্তার হন এবং তাঁকে পাকিস্তান কারাগারে অন্তরিন করা হয়। স্বাধীনতা ঘোষণার পর ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল সরকার গঠিত হয় এবং ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলায় মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে। এ সরকার প্রবাসী, বিপ্লবী, অস্থায়ী, মুজিবনগর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার নামে পরিচিত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন রাষ্ট্রপতি ও সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান। সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছিলেন উপরাষ্ট্রপতি (রাষ্ট্রপতির অবর্তমানে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন)। তাজউদ্দীন আহমদ ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। অর্থ, শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী ছিলেন ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী এবং স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, কৃষিমন্ত্রী ছিলেন এএইচএম কামারুজ্জামান।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় তাঁর অবর্তমানে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বদানকারী জাতীয় চার নেতা দলমতনির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে নয় মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বিজয়ের লাল সূর্যটি ছিনিয়ে আনেন। বাংলাদেশ সৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠ সহচর জাতীয় চার নেতার অবদান চিরস্মরণীয়। জেল হত্যা দিবস উপলক্ষে 'বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতা', 'বঙ্গবন্ধুর সাহসিকতা', 'জেল হত্যাকাণ্ড: কলঙ্কিত পঁচাত্তর এবং ইতিহাসের দায় শোধ' এবং 'জেল হত্যা: বঙ্গবন্ধুর আদর্শের নেতৃত্বকে নিশ্চিহ্ন করার অপচেষ্টা' শীর্ষক প্রবন্ধ ও নিবন্ধ দেখুন পৃ. **৪, ৭, ১২ ও ১৫**

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail : editorsb@dfp.gov.bd, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : এসোসিয়েটস্ প্রিন্টিং প্রেস
১৬৮ ডিআইটি এক্স. রোড, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০
e-mail : md_jwell@yahoo.com

বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতা

প্রফেসর ড. মো. মাহবুবর রহমান

বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক জীবনে ও বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে অসংখ্য নেতা-কর্মীর সাহচর্য পেয়েছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ সারা জীবন তাঁর সঙ্গে থেকেছেন। আবার কেউ কেউ তাঁর চলার পথে তাঁকে ত্যাগ করে চলে গেছেন। যেমন– মওলানা ভাসানী, আতাউর রহমান খান, আবদুস সালাম, মোহাম্মদ তোয়াহা, কামরুদ্দীন আহমেদ, অলি আহাদ প্রমুখের সঙ্গে তাঁর আদর্শিক মিল কখনই হয়নি। কিন্তু বঙ্গবন্ধু এমন কিছু বিশ্বস্ত সাথি পেয়েছিলেন যাঁদের সাহায্য ছাড়া তিনি হয়ত ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারতেন না। বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়ায় বঙ্গবন্ধুর পর পরই তাঁদের স্থান। এই বিশ্বস্ত সাথিদের মধ্যে অনেকেই সারা জীবন নিজ নিজ জেলাতেই রাজনীতি করেছেন ও তৃণমূল পর্যায়ে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগকে শক্তিশালীকরণে ভূমিকা রেখেছেন। আবার কেউ কেউ জাতীয় নেতায় পরিণত হয়েছেন, যেমন– তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এএইচএম কামারুজ্জামান ও ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত খুনি মোশতাকের গঠিত সরকারে যোগদান বা সমর্থন করতে অস্বীকার করার মাধ্যমে তাঁরা শহিদ বঙ্গবন্ধুর প্রতি তাঁদের বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য বজায় রেখেছেন এবং পরিণামে জেলখানায় আটকাবস্থায় ৩রা নভেম্বর (১৯৭৫) নির্মম হত্যার শিকার হয়েছেন। বিনিময়ে জাতি তাঁদেরকে 'শহিদ জাতীয় নেতার' মর্যাদা দান করেছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে তাঁরা 'শহিদ জাতীয় চার নেতা' হিসেবে অভিহিত হয়ে আছেন। বঙ্গবন্ধুর প্রায় সমবয়সি এই চার জাতীয় নেতা ১৯৫০-এর দশক থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত আমৃত্যু বঙ্গবন্ধুর আনুগত্য ও নির্দেশ মেনে চলেছেন। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাঁরা বিশ্বস্ততা ও যোগ্যতার সাথে মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং দেশ শত্রুমুক্ত করেছেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর বঙ্গবন্ধু শূন্য এই দেশে খুনি মোশতাকের প্রস্তাব মেনে নিলে তাঁরা মন্ত্রিত্ব বা আরও অন্য কোনো সুযোগ-সুবিধা পেতেন, কিন্তু জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেও তাঁরা খুনিদের প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদ করেছেন। ফলে তাঁদেরকেও জীবন দিতে হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর প্রতি এই বিশ্বস্ততার কারণে আজ তাঁরা ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। শুধু ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর জেলখানায় বন্দি অবস্থায় মোশতাকের ঘাতক বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে খুন হয়েছিলেন বলেই তাঁরা জাতীয় নেতার মর্যাদা লাভ করেননি, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে তাঁদের ভূমিকার জন্য তাঁরা জাতীয় নেতার মর্যাদা লাভ করেছেন। কী ছিল তাঁদের অবদান? নিম্নলিখিত তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনী থেকে রাজনীতিতে তাঁদের অবস্থান ও অবদান সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে।

শহিদ তাজউদ্দীন আহমদ (২৩.৭.১৯২৫-৩.১১.১৯৭৫)

গাজীপুরের কাপাসিয়ায় দরদরিয়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ষষ্ঠ শ্রেণির এম.ই. স্কলারশিপ পরীক্ষায় ঢাকা জেলায় প্রথম স্থান, ১৯৪৪ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে দ্বাদশ স্থান, ১৯৪৬ সালে আই.এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। এরপর ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি অর্জন করার পর আইন শাস্ত্রে ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি নিয়মিত লেখাপড়ার পাশাপাশি স্বউদ্যোগে পবিত্র কোরানে হাফেজ হন। ছাত্রজীবনে তিনি স্কাউট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৪৪ সালে তিনি বঙ্গীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নিযুক্ত হন এবং ১৯৪৫ ও ১৯৪৭ সালে দিল্লি কনভেনশনে যোগ দেন। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর তিনি ভাষা আন্দোলনে (১৯৪৮-১৯৫২) নেতৃত্ব দেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের কার্যনির্বাহী পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য (১৯৫১-১৯৫৩) ছিলেন। ১৯৫৩ সালে তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগ দেন এবং ঢাকা জেলা আওয়ামী মুসলিম লীগের

সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন। যুক্তফ্রন্ট থেকে ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য এবং ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৫ সালে তিনি আওয়ামী লীগের সংস্কৃতি ও সমাজসেবা সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি হলে তিনি কারাবরণ করেন। তিনি ১৯৬৪ সালে পুনর্গঠিত আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব লাভ করেন। ১৯.৩.১৯৬৬ তারিখে তিনি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। সেসময় বঙ্গবন্ধু দলের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৬৬ সালে ছয় দফা উত্থাপনের সময় তিনি বঙ্গবন্ধুর সাথে লাহোরে উপস্থিত ছিলেন এবং বঙ্গবন্ধুর সাথে থেকে তিনি ছয় দফার আন্দোলন পরিচালনা করেন। ১৯৬৬-১৯৬৯ সময়কাল ছিল তাঁর বন্দিজীবন। ১৯৬৬ সালের ৮ই মে গ্রেপ্তার হন এবং ১৯৬৯ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি মুক্তিলাভ করেন। ১৯৭০-এ তিনি জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭১-এ অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনায় বঙ্গবন্ধুর সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। সেসময় ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলোচনার সময় তিনি বঙ্গবন্ধুর সাথে থাকতেন। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদান করেন এবং বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন (১০.০১.১৯৭২) পর্যন্ত উক্ত দায়িত্ব সফলতার সাথে পালন করেন। ১১.১.১৯৭২ থেকে ২৫.১০.১৯৭৪ পর্যন্ত তিনি বঙ্গবন্ধু সরকারের অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ২৬.১০.১৯৭৪ তারিখে তিনি মন্ত্রিপরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৭৫-এ ঢাকা কেন্দ্রীয় জেলখানায় বন্দি থাকা অবস্থায় ৩রা নভেম্বর সেনাবাহিনীর কতিপয় সদস্যের হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে তিনি, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এম মনসুর আলী ও এএইচএম কামারুজ্জামান নিহত হন। ৫ই নভেম্বর বনানী কবরস্থানে শহিদ কামারুজ্জামান বাদে বাকি তিন শহিদকে সমাহিত করা হয়। শহিদ কামারুজ্জামানের মরদেহ রাজশাহীতে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

শহিদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম (১৮.২.১৯২৫-৩.১১.১৯৭৫)

কিশোরগঞ্জ জেলায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম.এ. ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম নেতা ছিলেন। ১৯৪৯ সালে পাকিস্তান সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিসের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কর বিভাগে চাকরি লাভ করেন। কিন্তু ১৯৫১ সালে চাকরি ছেড়ে দিয়ে ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে ইতিহাসে অধ্যাপনার চাকরি গ্রহণ করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি আইন পাস করে ময়মনসিংহ আদালতে আইন ব্যাবসা শুরু করেন এবং আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ১৯৫৭ সালে তিনি ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ৮.৩.১৯৬৪ থেকে ১৬.৪.১৯৭২ পর্যন্ত তিনি আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সিনিয়র সহ-সভাপতি ছিলেন। বঙ্গবন্ধু জেলে আটক থাকা অবস্থায় ৮.৫.১৯৬৬ থেকে ২১.২.১৯৬৯ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তিনি মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। স্বাধীন বাংলাদেশে ১১.১.১৯৭২ থেকে ২৫.১.১৯৭৫ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু সরকারের শিল্পমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী অনুসারে বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতি এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপরাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হন (২৬.১.১৯৭৫)। তিনি বাকশালের কার্যনির্বাহী কমিটির দুই নম্বর সদস্য ছিলেন। ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি থাকা অবস্থায় তিনি সেনাবাহিনীর কতিপয় সদস্যের হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন (৩.১১.১৯৭৫)।

শহিদ আবুল হাসনাত মোহাম্মদ কামারুজ্জামান (২৬.৬.১৯২৩-৩.১১.১৯৭৫)

বর্তমান নাটোর জেলার বাগাতিপাড়া থানায় নূরপুর গ্রামে মাতুলালয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার বাসস্থান রাজশাহী শহরের কাদিরগঞ্জ। তাঁর ডাকনাম হেনা। রাজশাহীতে তিনি 'হেনা ভাই' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর দাদা হাজী লাল মোহাম্মদ সরদার (১৮৪৮-১৯৩৬) স্থানীয় জমিদার ছিলেন ও দুবার (১৯২৪-১৯২৬, ১৯৩০-১৯৩৬) অবিভক্ত বাংলার আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর পিতা আবদুল হামিদ মিয়া (১৮৮৭-১৯৭৬) রাজশাহী জেলা মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। তিনি ১৯৪৬-এ বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। শহিদ কামারুজ্জামান ১৯৪২ সালে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন, ১৯৪৪ সালে রাজশাহী কলেজ থেকে আই.এ., ১৯৪৬ সালে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক ডিগ্রি এবং ১৯৫৬ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল.এল.বি. ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯৪২-এ নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের রাজশাহী জেলা শাখার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৪৩-১৯৪৫ সময়কালে তিনি নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। বঙ্গবন্ধু যখন কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র, এএইচএম কামারুজ্জামান তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়নরত। উভয়ই তখন ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সেসময় তাঁদের পরিচয় ছিল। ১৯৫৬ সালে তিনি রাজশাহী আদালতে আইন পেশা শুরু করেন ও আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। ১৯৫৬-১৯৬৪ সময়কালে তিনি রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৬২ ও ১৯৬৫ সালে তিনি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। শহিদ কামারুজ্জামান ১৯৬৭-১৯৭০ সময়কালে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক ও ১৯৭০-১৯৭১-এ নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। বঙ্গবন্ধু রাজশাহী ও উত্তরবঙ্গ সফরে এলে কামারুজ্জামান তাঁর সফরসঙ্গী হতেন। জাতীয় পরিষদের সদস্য হিসেবে তিনি পরিষদ সভায় ছয় দফার পক্ষে যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক হিসেবে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে ছয় দফার পক্ষে প্রচারণা চালান। উনসত্তরের গণ-আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে তিনি ১৯৬৯ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৭০-এর নির্বাচনে তিনি আবারও পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। মুজিবনগর সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী (১০.৪.১৯৭১-২২.১২.১৯৭১), স্বাধীন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী (২৩.১২.১৯৭১-১১.১.১৯৭২), বঙ্গবন্ধু সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী (১২.১.১৯৭২-১৬.৩.১৯৭৩) এবং বাণিজ্য মন্ত্রীর (১৬.৩.১৯৭৩-১৮.২.১৯৭৪) দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৩ সালে তিনি জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। বঙ্গবন্ধুর অভিপ্রায় অনুযায়ী তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন (১৮.২.১৯৭৪-২৬.১.১৯৭৫)। ২৬.১.১৯৭৫ তারিখে পুনরায় বাণিজ্য মন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন। বাকশাল গঠিত হলে তিনি তার কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হন। ১৯৭৫-এর ৩রা নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি থাকা অবস্থায় সশস্ত্র বাহিনীর কতিপয় ব্যক্তির হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন।

শহিদ ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী (১৬.১.১৯১৭-৩.১১.১৯৭৫)

সিরাজগঞ্জ জেলার কাজীপুরের বরইতলা গ্রামে মাতুলালয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। নিজ গ্রাম কুড়িপাড়া। সিরাজগঞ্জ বিএল হাইস্কুল থেকে ১৯৩৫ সালে ম্যাট্রিকুলেশন, ১৯৩৯ সালে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ থেকে আই.এ., ১৯৪২ সালে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক সম্মান ও ১৯৪৩ সালে এম.এ. এবং আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে (১৯৪৩-১৯৪৫) এল.এল.বি. ডিগ্রি অর্জন করেন (১৯৪৫)। ইসলামিয়া কলেজে অধ্যয়নকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। ১৯৪৫ সালেই তিনি পাবনা আদালতে আইন ব্যাবসা শুরু করেন। ১৯৫৮ সালে ঢাকা হাইকোর্ট বারে যোগদান করলেও পাবনাতেই তিনি প্র্যাকটিস করতেন। তিনি পাবনা জেলা আইনজীবী সমিতির পরপর তিনবার সাধারণ সম্পাদক ও পাঁচবার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। পাবনা শহরের রাঘবপুরে তিনি বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন। ১৯৪৬-১৯৫০ সময়কালে পাবনা জেলা মুসলিম লীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। সেসময় মুসলিম লীগের পাকিস্তান ন্যাশনাল হোম গার্ড বাহিনীর পাবনা জেলা শাখার অনারারি ক্যাপ্টেন ছিলেন বিধায় তিনি ক্যাপ্টেন মনসুর আলী নামে পরিচিত হন। ১৯৫১ সালে তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদান করেন ও পাবনা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি পাবনায় ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। উত্তরবঙ্গে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সফরে তিনি সবসময় তাঁর সফরসঙ্গী হিসেবে যুক্ত থাকতেন। যুক্তফ্রন্ট থেকে ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলা আইন পরিষদের কাজীপুর আসন থেকে সদস্য ও ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্যও নির্বাচিত হন। ১৯৫৬-১৯৫৮ সময়কালে আতাউর রহমান খানের প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায় পর্যায়ক্রমে আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী (১৯৫৬-১৯৫৭), খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী (১৯৫৭-১৯৫৮), বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্পমন্ত্রীর (১৯৫৮) দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে দেশে সামরিক আইন জারি হলে তিনি নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার হন ও ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বরে মুক্তি লাভ করেন। ছয় দফা আন্দোলনের সময়ও তিনি আটক হন। ১৯৭০-এ তিনি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। মুজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রী ছিলেন। বঙ্গবন্ধু সরকারের পর্যায়ক্রমে যোগাযোগ (১৩.১.১৯৭২-৮.৭.১৯৭৪) এবং স্বরাষ্ট্র ও যোগাযোগ মন্ত্রীর (৮.৭.১৯৭৪-২৬.১.১৯৭৫) দায়িত্ব পালন করেন। সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর পর গঠিত সরকারে বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতি, এম মনসুর আলী প্রধানমন্ত্রী (২৬.১.১৯৭৫-১৫.৮.১৯৭৫) নির্বাচিত হন।

বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর খুনি মোশতাকের সরকারে যোগদানের আমন্ত্রণ তিনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। তাই তাঁকে ৩.১১.১৯৭৫ তারিখে জেলে বন্দি অবস্থায় রিসালদার মোসলেমের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর কতিপয় সদস্য কর্তৃক গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ দিতে হয়।

বর্ণিত শহিদ জাতীয় চার নেতার সংক্ষিপ্ত জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, বঙ্গবন্ধুর প্রতিটি রাজনৈতিক কর্মসূচিতে তাঁদের সম্পৃক্ততা ছিল। তাঁরা প্রত্যেকেই বঙ্গবন্ধুর প্রায় সমবয়সি ছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই উচ্চশিক্ষিত এবং মেধাবী ছিলেন। তাঁদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে শিক্ষা যুক্ত হওয়ায় তাঁদের অধিকাংশ কর্ম গুণান্বিত হয়েছে। শহিদ কামারুজ্জামান ও শহিদ মনসুর আলী বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কলকাতাতেই পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই ১৯৫০-এর দশকের শুরু কিংবা মাঝামাঝি সময়ের দিকে আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদান করেন এবং নিজ নিজ জেলায় সাধারণ সম্পাদক বা সভাপতির দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে দলকে শক্তিশালী করেন। তাঁরা সকলেই নিজ নিজ অঞ্চলে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সফরসঙ্গী হিসেবে যুক্ত থাকতেন। তাঁরা প্রত্যেকেই ভাষা আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। তাজউদ্দীন আহমদ ও ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদ এবং ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি হলে তাজউদ্দীন আহমদ ও ক্যাপ্টেন মনসুর আলী বৎসরাধিককাল জেলে আটক ছিলেন। শহিদ কামারুজ্জামান ১৯৬২ ও ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়ে পরিষদে বাঙালির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় উপস্থাপন করতেন। তাঁরা সকলেই ছয় দফা আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন। ১৯৬০-এর দশকের শুরুতেই তাঁরা আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্থান করে নেন। তাজউদ্দীন আহমদ দলের সাধারণ সম্পাদক (১৯৬৬) এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু শহিদ কামারুজ্জামানকে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। জাতীয় চার নেতাই মুজিবনগর সরকারের সদস্য (উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীসহ) মনোনীত হয়েছিলেন। ১৯৭১ সালে পরিবার-পরিজন ত্যাগ করে তাঁরা প্রত্যেকেই কৃচ্ছ্র জীবনযাপন করেছেন। তাঁদের দক্ষতা ও বিচক্ষণতা এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণেই মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। ১৯৭২ সালের ১১ই জানুয়ারি সরকার গঠন করার পর থেকে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত তাঁরা প্রত্যেকেই বঙ্গবন্ধু সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছিলেন। তাঁরা যোগ্যতার সাথে সে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর তাজউদ্দীন আহমদকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার প্রস্তাব করা হলেও তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং নিজেও নিহত হন। এখানেও তিনি জাতীয় নেতার সঠিক পরিচয় দিয়েছিলেন।

জাতীয় চার নেতার প্রত্যেকেই ছিলেন মনেপ্রাণে অসাম্প্রদায়িক। তাঁরা প্রত্যেকেই বঙ্গবন্ধু প্রতিশ্রুত ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা' গড়ার কাজে তাঁরা ছিলেন আত্মনিবেদিত প্রাণ। তাঁদের রাজনীতির ভিত্তি ছিল সাধারণ মানুষ। তাঁদের স্বপ্ন ছিল জনগণের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁদের ছিল অপরিসীম দরদ ও ভালোবাসা। তাঁদের জনপ্রিয়তা ছিল আকাশচুম্বী। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন সৎ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর পর জাতীয় চার নেতার নামই ইতিহাসে সগৌরব স্থান পেয়েছে। বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির পিতা। তাঁর বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন জাতীয় চার নেতা। জেলখানায় বন্দি এই জাতীয় চার নেতা অনেক ভয়-ভীতি সত্ত্বেও খুনি মোশতাককে সমর্থন করেননি। ফলে তাঁদেরকে ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর জীবন দিতে হয়েছে। এজন্য দেশের মানুষ এখনও ১৫ই আগস্ট ও ৩রা নভেম্বরকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে।

প্রফেসর ড. মো. মাহবুবর রহমান: ইতিহাসবিদ ও অধ্যাপক (অব.), ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, mahabub52_heritage@yahoo.com

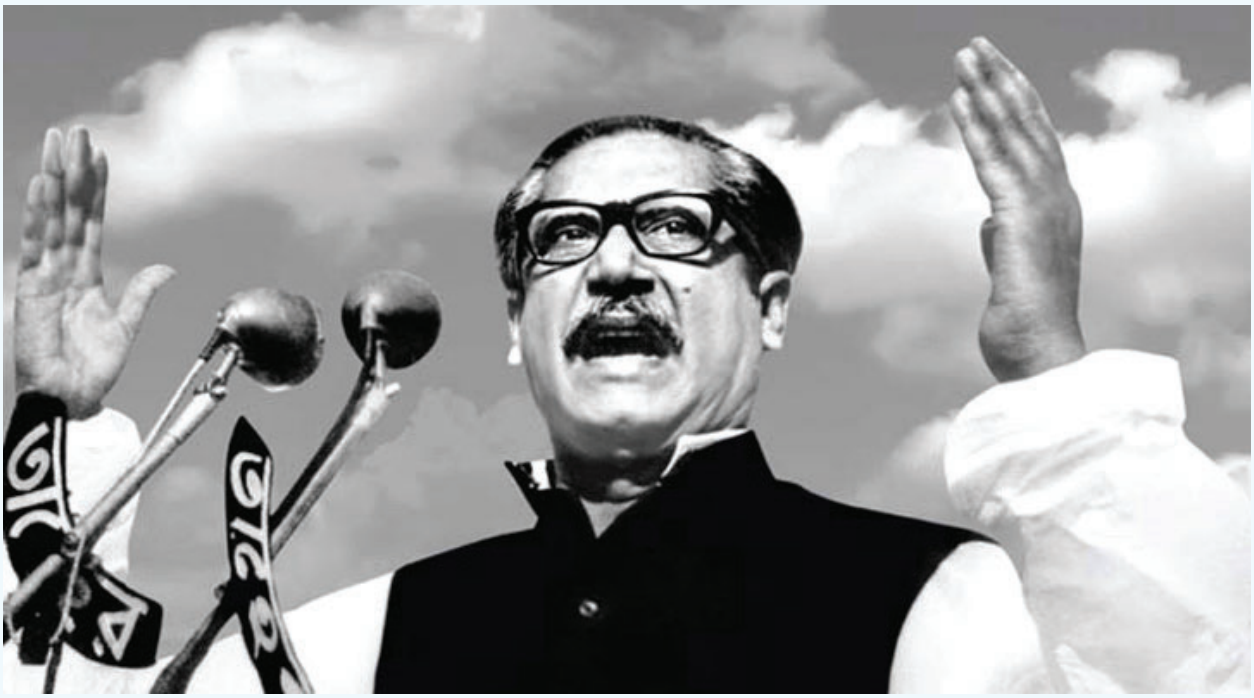

বঙ্গবন্ধুর সাহসিকতা

প্রফেসর ড. সরকার আবদুল মান্নান

মানুষের সাহসিকতার কি কোনো সংজ্ঞা হয়? কিংবা কোনো কর্ম ও আচরণের পরিধির মধ্যে কি মানুষের সাহসিকতাকে সীমাবদ্ধ করা যায়? এই প্রশ্নের কোনো সুনির্দিষ্ট উত্তর নেই। মানুষের সাহসিকতা নিয়ে ভাবনার সূচনা হয় প্রাচীন গ্রিক সভ্যতায়। তার নীতিশাস্ত্র ও দর্শনে এবং আরও পরে স্নায়ুবিজ্ঞানে মানুষের সাহসিকতার স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য নিয়ে গবেষণা হয়। প্লেটো মনে করতেন সাহসিকতা মানুষের আত্মার তিনটি অংশের সঙ্গে সম্পর্কিত। অংশ তিনটি হলো– বৌদ্ধিক (reason), আত্মিকতা (spiritedness) এবং প্রবৃত্তি (appetite)। এবং তিনি মনে করতেন মানুষ তার এই সাহসিকতার উন্মেষ ঘটায় অর্থ উপার্জনের জন্য (the moneymakers), শহর রক্ষার জন্য (auxiliaries) এবং শাসনকার্য পরিচালনার জন্য (rule)। তবে তিনি মনে করতেন নিজের প্রবৃত্তি ও লিপ্সাকে নিয়ন্ত্রণ করে সমাজ ও রাষ্ট্র শাসন করাই হলো সাহসিকতা।[১]

এরিস্টোটল তাঁর নীতিদর্শনে সাহসিকতা নিয়ে আরও বিস্তারিত অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে,

> Aristotle provides a more detailed account of the virtues and courage in his Nicomachean Ethics. For Aristotle, a moral virtue or arête is a quality or state of excellence in the human soul that leads to good actions and the ultimate fulfillment of the human life, namely, happiness or eudaimonia. This quality of virtue is not a mechanistic instinct or impulse to act in a certain manner; nor is it a pietistic obedience to fixed rules or moral laws. Rather it is the building of a solid and stable disposition within the human being. Such a disposition is acquired over time through practice and the conscious cultivation of good habits. Ultimately the acquisition of the many virtues leads to a strong and healthy character.[2]

'Moral Courage: Definition and Development' নামক একটি প্রবন্ধে Rielle Miller বলেছেন, "But when asked to go deeper, to really define courage, the only response that comes to mind is 'I know it when I see it.' What makes courage so hard to define?"[৩] সত্যিকার অর্থে কারো সাহসিকতাকে একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা প্রায় অসম্ভব। কেননা, মনোদৈহিক এতসব উপাদান এই সাহসিকতার সঙ্গে জড়িত যার কোনো সুনির্দিষ্ট পরিধি নেই। তবে চে গুয়েভারা সংজ্ঞার মতো করেই বলেছেন, 'একজন মানুষের জীবনের চূড়ান্ত সময় তখনই আসে, যখন তিনি মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি যদি মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করেন, তাহলে তিনি একজন বীর, তা তিনি সফল হোন বা না হোন। তিনি ভালো বা মন্দ রাজনীতিক হতে পারেন, কিন্তু তিনি যদি মৃত্যুর মুখোমুখি না হন, তাহলে তিনি একজন রাজনীতিকের চেয়ে বেশি কিছু নন।'[৪] প্লেটো, এরিস্টোটল ও অন্যান্যদের সাহসিকতা বিষয়ক দর্শন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনাদর্শের সঙ্গে অনেকাংশেই মিলে যায়। বিশেষ করে চে গুয়েভারার এই জীবনাভিজ্ঞতার সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের পুরো রাজনৈতিক জীবনের সম্পর্ক ওতপ্রোত। কমপক্ষে আগরতলা মামলায় এবং পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধু স্পষ্টতই মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিলেন। তাঁকে মেরে ফেলার জন্যই বিচারের নামে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী দুই-দুইবার প্রহসনের আশ্রয় নিয়েছিল। সেই সময় পর্যন্ত উপমহাদেশের রাজনীতিতে একমাত্র শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধেই প্রথম এমন অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। প্রথমে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' হয়েছিল যার শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত ছয় দফার পক্ষে দেশব্যাপী গণ-আন্দোলন শুরু হলে সামরিক শাসক আইয়ুব খান নিজেকে নিরাপদ করার জন্য শেখ মুজিবকে ফাঁসিতে

ঝুলিয়ে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ওই অভিলাষ ফলপ্রসূ হয়নি। অধিকন্তু শেখ মুজিবের মুক্তির জন্য গণ-আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয় এবং আইয়ুব সরকার নিঃশর্তে শেখ মুজিবসহ সকল আসামিকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয়বার অধিক ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয় মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়। বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশ থেকে গ্রেপ্তার করে পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি করা হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলা দায়ের করা হয় যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড এবং ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ডের আদেশও প্রদান করা হয়। কিন্তু ততদিনে পাকিস্তান সেনাবাহিনী যুদ্ধে পরাজিত হয় এবং আত্মসমর্পণ করে। ক্ষমতারও পরিবর্তন হয়– ইয়াহিয়া খানের জায়গায় জুলফিকার আলী ভুট্টো ক্ষমতা গ্রহণ করেন। ফলে বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ কার্যকর হয়নি।

অনিবার্য মৃত্যুর ওই সময়গুলোতে শেখ মুজিবুর রহমানের মনোদৈহিক পরিস্থিতি কেমন ছিল? *Healthwise* নামক একটি মেডিক্যাল জার্নালে লেখা হয়েছে :

> As death approaches, you may become less interested in the outside world and the specific details of daily life, such as the date or time. You may turn more inward and be less socially involved with others. You may want only a few people to be close. This introspection may be a means of letting go and saying good-bye to everything you have known.
>
> In the days before death, you may enter a phase of unique conscious awareness and communication that can be misinterpreted as confusion by your caregivers and loved ones. You may talk about needing to go somewhere, about 'going home' or 'going away.' The meaning of this communication is not known, but some people feel this talk helps you to prepare for your approaching death.[5]

মৃত্যুর মুখোমুখি হলে একজন সাধারণ মানুষের মনোদৈহিক ও আবেগিক অনেক পরিবর্তন ঘটে। বাইরের জীবন ও জগৎ থেকে সে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এবং নিজের মধ্যে ডুবে যায়। দৈনন্দিনের জীবনাচরণ বিস্মৃত হয়, দিন-তারিখ ও সময়জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। খুব কাছের কিছু মানুষ ছাড়া সামাজিক ও রাজনৈতিক সকল লোকজন ও কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয় এবং তার মধ্যে নানা ধরনের বিভ্রম তৈরি হয়। মৃত্যুর মুখোমুখি সময়ে সাধারণ মানুষের এই হলো মনোদৈহিক অভিব্যক্তি। কিন্তু জীবনাচরণে বঙ্গবন্ধু অতি সাধারণ মানুষ হলেও মনের গড়নে, আদর্শ ও বিশ্বাসে, মূল্যবোধ ও নৈতিক দৃঢ়তায় এবং সর্বোপরি সাহসিকতায় তিনি অসাধারণ মানুষ ছিলেন। বাঙালি জাতির হাজার বছরের ইতিহাসে ওই উচ্চতায় কেউ আর পৌঁছাতে পারেনি। ফলে একাধিকবার মৃত্যুর মুখোমুখি হলেও তাঁর মধ্যে উপরোক্ত কোনো মনোদৈহিক ও আবেগিক পরিবর্তন ঘটেনি। জেলখানার মধ্যে তিনি অত্যন্ত স্বাভাবিক জীবনযাপন করেছেন এবং ভেতরে লালন করেছেন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত। তিনি যেন ওই প্রহসনের বিচার ব্যবস্থাকে গুড়িয়ে দিতে চান। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, প্রচণ্ড ওই ক্ষোভ ভেতরে লালন করলেও বাহ্যত তিনি বিচারিক কর্মকাণ্ডকে সহযোগিতা করেছেন এবং সম্মান প্রদর্শনও করেছেন। আবার মাঝেমধ্যে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, এই প্রহসনের বিচারকে তিনি থোরাই পরোয়া করেন। এ হলো একজন চিরকালের বীরের স্বভাব। যিনি দেশকে ভালোবাসেন, দেশের মানুষকে ভালোবাসেন, দেশের মানুষের মুক্তির জন্য যিনি আজীবন সংগ্রাম করে যাচ্ছেন, দেশের মানুষ যাকে গভীরভাবে বিশ্বাস করে, ভালোবাসে এবং যাঁর নেতৃত্বের অগ্নিমন্ত্রে মানুষ দীক্ষিত হয়ে জেগে উঠেছে, তাঁর আবার মৃত্যুভয় কী! তিনি তো মৃত্যুঞ্জয়ী। সুতরাং চে গুয়েভারা মৃত্যুর মুখোমুখি একজন বীরের যে স্বভাবের কথা বলেছেন তার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শের তাৎপর্যপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে।

মানুষ ভয় পায়। সত্য কথা বলতে ভয় পায়, মিথ্যা ও অসত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে ভয় পায়, শোষণ-নিপীড়ন ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে ভয় পায়। এক কথায়, সাধারণ মানুষ সামান্যতেই ভয় পায়। মানুষ কেন ভয় পায়, তার নিশ্চয়ই মনস্তাত্ত্বিক ও শরীরবৃত্তীয় কারণ আছে। কিন্তু বিরল কিছু মানুষ ভয় পান না। কোনো পরিস্থিতিই তাদের ভীত করে তুলতে পারে না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেই বিরলপ্রজ মানুষদের একজন যিনি কখনোই ভয় পেতেন না। যে-কোনো পরিস্থিতিকে সামাল দেওয়ার মতো আত্মবিশ্বাস ও অসাধারণ দক্ষতা ছিল তাঁর। ফলে সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার অভিপ্রায় ছিল তাঁর আজন্মের প্রেরণা। স্বাধীনতা উত্তরকালের একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন এস এ করিম। তিনি লিখেছেন :

> সে সময় বাংলাদেশ রাইফেলস (বিডিআর) ও মুক্তিযোদ্ধারা একসঙ্গেই পিলখানায় বিডিআর ব্যারাকে থাকতেন। বিডিআরের সব সদস্য মুক্তিযোদ্ধা না হওয়ায় মুক্তিযোদ্ধারা মনে করলেন, বিডিআরের চাকরি তাঁদের জন্য যথেষ্ট নিরাপদ নয়। তখন পরিস্থিতি সামাল দিতে মুজিব নিজেই পিলখানায় যেতে চাইলে তাঁর রাজনৈতিক সচিব তোফায়েল আহমেদসহ অনেকেই সেই সিদ্ধান্তের প্রবল বিরোধিতা করেন। তোফায়েল আহমেদ এই মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়োগের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ফলে তাঁর মনে ভয় ছিল, সেখানে গেলে মুজিবকে অপমান করা হতে পারে, এমনকি তাঁকে শারীরিকভাবেও লাঞ্ছিত করা হতে পারে। মুক্তিযোদ্ধাদের একটি কট্টর অংশ মনে করত, রাজনীতিকেরা সরাসরি যুদ্ধ না করেও যুদ্ধের সুফল ভোগ করছেন, কিন্তু কেউই তাঁদের কথা ভাবছিল না। মুজিব কারও কথা না শুনে কোনো দেহরক্ষী ছাড়াই সেখানে চলে যান। তাঁদের রক্ষীবাহিনীতে আত্তীকরণ করা হবে– এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি তাঁদের শান্ত করেন।[৬]

বঙ্গবন্ধুর এই সাহসিকতার আর্কেটাইপ কোথায়? কোন সেই পরম্পরার উত্তরাধিকার তিনি লালন করেছেন এবং নিজেই বা কোন পরিস্থিতির মধ্যে বেড়ে উঠেছেন যেখানে ভয়ের কোনো কারণ কখনোই ঘটেনি বরং ভয়হীন, দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন পরিবেশে তিনি বেড়ে উঠতে পেরেছিলেন। একজন শিশুর বেড়ে ওঠার প্রক্রিয়ার সঙ্গে তাঁর মনোগড়ন, আবেগ ও আবেগ নিয়ন্ত্রণের বিষয়গুলো জড়িত। শৈশব থেকে শেখ মুজিবুর রহমান একটি আনন্দিত পরিবেশে বেড়ে উঠেছেন এবং পরবর্তী জীবনে যে জনসম্পৃক্ততা তিনি অর্জন করেছেন তার মধ্যে নিহিত আছে তাঁর সাহসিকতার ইতিহাস। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, 'আব্বার কাছে থেকেই আমি লেখাপড়া করি। আব্বার কাছেই আমি ঘুমাতাম। তাঁর গলা ধরে না ঘুমালে আমার ঘুম আসত না। আমি বংশের বড় ছেলে, তাই সমস্ত আদর আমারই ছিল।'[৭] শুধু বাবাই নন, পরিবারের সবাই তাঁকে আদর করত, এমনকি পাড়াপ্রতিবেশীরা তাঁকে স্নেহ করত, 'মিয়া ভাই' বলে সম্মান করত। শিশুকে সম্মান করার সংস্কৃতি আমাদের সমাজে বিরল। শিশুকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, অপমান-অপদস্ত করা, শারীরিক ও মানসিকভাবে শাস্তি দেওয়া– এসব আমাদের সমাজে নিত্যদিনের ঘটনা। এমনকি স্কুল-মাদ্রাসায়ও প্রতিদিন শিশুদের

ওপর এসব নির্যাতন-নিপীড়ন সংঘঠিত হয়। কিন্তু ঐতিহ্যবাহী শেখ পরিবারে শিশুবান্ধব একটি পরিবেশ সর্বদাই বিরাজমান ছিল। বিশেষ করে শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার স্মৃতিচারণ ও অন্যান্য তথ্যাদি থেকে জানা যায় যে, একটি উদার-উন্মুক্ত পরিবেশে বেড়ে উঠেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। ফলে তাঁর মধ্যে ভয় সঞ্চারিত হয়নি, হীনম্মন্যতা ও অপরাধবোধ দ্বারা তিনি কখনোই পরিচালিত হননি। অধিকন্তু তাঁর মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও সাহসিকতা একটি স্থায়ী মনোগড়নের অবয়ব লাভ করেছিল। এক ধরনের মানসিক স্বাস্থ্য ও পুষ্টির মধ্যে তাঁর বিকাশ ঘটে যার মধ্যে মানবসম্পৃক্ততা একটি বিশেষ অধ্যায় হিসেবে পরিগণিত হতে পারে।

খুব সুস্থির, সুবোধ ও নিরীহ বালক ছিলেন না শেখ মুজিবুর রহমান। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*'তে তিনি লিখেছেন :

> আমি ভীষণ একগুঁয়ে ছিলাম। আমার একটা দল ছিল। কেউ কিছু বললে আর রক্ষা ছিল না। মারপিট করতাম। আমার দলের ছেলেদের কেউ কিছু বললে একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়তাম। আমার আব্বা মাঝে মাঝে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতেন। কারণ ছোট শহর, নালিশ হত; আমার আব্বাকে আমি খুব ভয় করতাম। আর একজন ভদ্রলোককে ভয় করতাম, তিনি আবদুল হাকিম মিয়া। তিনি আমার আব্বার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। একসঙ্গে চাকরি করতেন, আমাকে কোথাও দেখলেই আব্বাকে বলে দিতেন, অথবা নিজেই ধমকিয়ে দিতেন। যদিও আব্বাকে ফাঁকি দিতে পারতাম, তাঁকে ফাঁকি দিতে পারতাম না।[৮]

শেখ মুজিবুর রহমানের বেড়ে উঠার এই প্রক্রিয়ার মধ্যে তাঁর ব্যক্তিত্বের গড়ন তৈরি হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পরিবারে তিনি খুব আদর পেতেন। পাড়াপ্রতিবেশীদের মধ্যেও তাঁর আদরের কমতি ছিল না। কিন্তু কখনোই তিনি উচ্ছৃঙ্খল হওয়ার সুযোগ পাননি। বরং একধরনের স্বাস্থ্যকর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এবং আদর ও শাসনের সুস্থ-সুন্দর পরিবেশের মধ্যে তিনি বেড়ে ওঠার সুযোগ পান। ফলে সাহসিকতার যে সৌন্দর্য তাঁর মধ্যে দানাবেঁধে উঠেছিল তা একসময় বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মতো প্রচণ্ড তাপ আর উষ্ণতা নিয়ে বিস্ফুরিত হয়েছিল। কিন্তু পরিমিতিবোধের লঙ্ঘন তিনি কখনো করেননি। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী যেভাবে তাঁকে নিপীড়ন ও নির্যাতন করত, সর্বক্ষণ তাঁকে যেভাবে চাপের মধ্যে রাখত, তাতে যে কেউ সাহসিকতার অপব্যবহার করতে পারতেন, অনিয়মতান্ত্রিক পথের আশ্রয় নিতে পারতেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর পুরো রাজনৈতিক জীবনে সাহসিকতার ওপর ভর করে কোনো অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। এমনকি যখন সমগ্র বাঙালি জাতি তাঁর স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে ৭ই মার্চে পরিষ্কারভাবে স্বাধীনতার ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করছিল, তখনও তিনি পরিণামবোধ ও নিয়মতান্ত্রিকতা বিস্মরণ হননি। স্বাধীনতার জন্য, মুক্তিযুদ্ধের জন্য, গেরিলা যুদ্ধের জন্য সকল নির্দেশনাই তিনি দিয়েছেন কিন্তু পরিষ্কারভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি, বিচ্ছিন্নতাবাদী কোনো বিপ্লবের পথ তিনি অনুসরণ করেননি। অথচ মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে নিয়মতান্ত্রিকভাবেই তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ দিবাগত রাতে অর্থাৎ ২৬শে মার্চ পূর্বাহ্নে।

নৈঃসঙ্গ্য ও একাকিত্ব তাঁর স্বভাবের মধ্যে কখনোই লক্ষ করা যায়নি। পাড়াপ্রতিবেশী, সহপাঠী ও বন্ধুবান্ধব নিয়ে তিনি শৈশব থেকেই দুর্দান্ত এক সামাজিক জীবনযাপন করেছেন। এবং সেই জীবনেই মানুষের প্রতি মমত্ববোধ, দরিদ্র ও অসহায়দের প্রতি সহমর্মিতাবোধ এবং একইসঙ্গে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের অসম সাহসিকতা তৈরি হয় তাঁর মধ্যে। ১৯৩৮ সালের কথা। শেরে বাংলা একে ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর গোপালগঞ্জে আসাকে কেন্দ্র করে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। শেখ মুজিবুর রহমান লিখেছেন :

> দু'একজন মুসলমানের উপর অত্যাচারও হল। আবদুল মালেক নামে আমার এক সহপাঠী ছিল।... একদিন সন্ধ্যায়, আমার মনে হয় মার্চ বা এপ্রিল মাস হবে, আমি ফুটবল মাঠ থেকে বাড়িতে এসেছি; আমাকে খন্দকার শামসুল হক ওরফে বাসু মিয়া মোক্তার সাহেব (পরে মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন) ডেকে বললেন, 'মালেককে হিন্দু মহাসভাপতি সুরেন ব্যানার্জির বাড়িতে ধরে নিয়ে মারপিট করছে। যদি পার একবার যাও। তোমার সাথে ওদের বন্ধুত্ব আছে বলে ছাড়িয়ে নিয়ে আস।' আমি আর দেরি না করে কয়েকজন ছাত্র ডেকে নিয়ে ওদের ওখানে যাই এবং অনুরোধ করি ওকে ছেড়ে দিতে। রমাপদ দত্ত নামে এক ভদ্রলোক আমাকে দেখেই গাল দিয়ে বসল। আমিও তার কথার প্রতিবাদ করলাম এবং আমার দলের ছেলেদের খবর দিতে বললাম। এর মধ্যে রমাপদ থানায় খবর দিয়েছে। তিনজন পুলিশ এসে হাজির হয়ে গিয়েছে। আমি বললাম, 'ওকে ছেড়ে দিতে হবে, না হলে কেড়ে নেব।'... এর মধ্যেই আমাদের সাথে মারপিট শুরু হয়ে গেছে। দুই পক্ষে ভীষণ মারপিট হয়। আমরা দরজা ভেঙে মালেককে কেড়ে নিয়ে চলে আসি।[৯]

ওই ঘটনার দিন তাঁর বাবা গোপালগঞ্জে ছিলেন না। তিনি শনিবারে নৌকায় করে ১৪ মাইল দূর টুঙ্গিপাড়া যেতেন এবং সোমবারে ফিরতেন। গোপালগঞ্জে তখন চরম উত্তেজনা চলছিল। শেখ মুজিবুর রহমানের অনেক আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের এজহারভুক্ত করা হয়েছে এবং তাঁর এক মামাসহ

অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁকেও গ্রেপ্তার করা হবে। শেখ মুজিব লিখেছেন :

> সকাল ন'টায় খবর পেলাম আমার মামা ও আরও অনেককে গ্রেফতার করে ফেলেছে। আমাদের বাড়িতে কি করে আসবে– থানার দারোগা সাহেবদের একটু লজ্জা করছিল! প্রায় দশটার সময় টাউন হল মাঠের ভিতর দাঁড়িয়ে দারোগা আলাপ করছে, তার উদ্দেশ্য হল আমি যেন সরে যাই। টাউন হলের মাঠের পাশেই আমার বাড়ি। আমার ফুফাতো ভাই, মাদারীপুর বাড়ি। আব্বার কাছে থেকেই লেখাপড়া করত, সে আমাকে বলে, 'মিয়াভাই, পাশের বাসায় একটু সরে যাও না।' বললাম, 'যাব না, আমি পালাব না। লোকে বলবে, আমি ভয় পেয়েছি।'[১০]

এই ঘটনার পর তাঁকে জেলে পর্যন্ত যেতে হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'এই আমার জীবনে প্রথম জেল।'[১১] কাউকে বা কিছুকে পরোয়া না করে অন্যায়ের প্রতিবাদে সৃষ্ট অপ্রীতিকর এই পরিস্থিতি তৈরি হলেও তাঁকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয়নি। বরং পরিবারের কাছ থেকে, বিশেষ করে তাঁর পিতার কাছ থেকে তিনি সর্বোচ্চ সহযোগিতা লাভ করেছেন। ফলে শৈশব থেকেই তাঁর মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও অদম্য সাহস তৈরি হয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় অনন্য ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠার মতো কিছু উপকরণ। আর তা হলো মানুষের প্রতি বিশ্বাস ও মমত্ববোধ, সংস্কৃতিচেতনা, উদার ধর্মবিশ্বাস ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ। টুঙ্গিপাড়া একটি প্রত্যন্ত গ্রাম হলেও বিশ শতকের গোড়ার দিকে তাঁর বাবা সেই সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকাগুলো বাড়িতে রাখতেন। শেখ মুজিবুর রহমান লিখেছেন, 'আমার আব্বা খবরের কাগজ রাখতেন। *আনন্দবাজার, বসুমতী, আজাদ, মাসিক মোহাম্মদী* ও *সওগাত*। ছোটকাল থেকে আমি কাগজ পড়তাম।'[১২] এই পত্রিকাগুলো তাঁর মনোগড়ন তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, তিনি পরিচিত হয়েছেন বিশ শতকের শিক্ষাদীক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতির সঙ্গে। এক কথায়, একটি আলোকিত জীবনের বিচিত্র জ্ঞানকাণ্ডের সঙ্গে পরিচয়ের ভেতর দিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়েছিল। অফুরন্ত সাহসিকতার সঙ্গে এই মনোরম ব্যক্তিত্ব তাঁকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় মানুষ করে তুলেছিল। তিনি যেখানেই যেতেন সেখানেই অসংখ্য মানুষ তাঁকে সংবর্ধিত করত এবং তাঁর সান্নিধ্য ও প্রাণৈশ্বর্য ওই স্থানটিকে আনন্দঘন ও কোলাহলমুখর করে তুলত। মানুষের এই ভালোবাসাকে তিনি স্রষ্টার অসীম রহমত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং এই ভালোবাসার জন্য তিনি যে-কোনো সময় জীবন উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* থেকে মানুষের এই ভালোবাসার একটি ঘটনা উল্লেখ করি। সময়টা ছিল ১৯৫৪ সাল– যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের সময়। শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ থেকে নির্বাচনের জন্য নমিনেশন পেয়েছিলেন। সেই সময় মানুষের ভালোবাসার একটি ঘটনা বঙ্গবন্ধু উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি এই :

> আমার মনে আছে খুবই গরিব এক বৃদ্ধ মহিলা কয়েক ঘণ্টা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, শুনেছে এই পথে আমি যাব, আমাকে দেখে আমার হাত ধরে বলল, 'বাবা আমার এই কুঁড়েঘরে তোমায় একটু বসতে হবে।' আমি তার হাত ধরেই তার বাড়িতে যাই। অনেক লোক আমার সাথে, আমাকে মাটিতে একটা পাটি বিছিয়ে বসতে দিয়ে এক বাটি দুধ, একটা পান ও চারআনা পয়সা এনে আমার সামনে ধরে বলল, 'খাও বাবা, আমার পয়সা কয়টা তুমি নেও, আমার তো কিছুই নাই।' আমার চোখে পানি এল। আমি দুধ একটু মুখে নিয়ে, সেই পয়সার সঙ্গে আরও কিছু টাকা তার হাতে দিয়ে বললাম, 'তোমার দোয়া আমার জন্য যথেষ্ট, তোমার দোয়ার মূল্য টাকা দিয়ে শোধ করা যায় না।' টাকা সে নিল না, আমার মাথায় মুখে হাত দিয়ে বলল, 'গরিবের দোয়া তোমার জন্য আছে বাবা।' নীরবে আমার চক্ষু দিয়ে দুই ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়েছিল, যখন তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসি। সেদিনই আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, 'মানুষেরে ধোঁকা আমি দিতে পারব না।' এরকম আরও অনেক ঘটনা ঘটেছিল। আমি পায়ে হেঁটেই এক ইউনিয়ন থেকে অন্য ইউনিয়নে যেতাম। আমাকে রাস্তায় রাস্তায়, গ্রামে গ্রামে দেরি করতে হত। গ্রামের মেয়েরা আমাকে দেখতে চায়। আমি ইলেকশনে নামার পূর্বে জানতাম না, এ দেশের লোক আমাকে কত ভালোবাসে। আমার মনের একটা বিরাট পরিবর্তন এই সময় হয়েছিল।[১৩]

সত্যিকার অর্থে ১৯৫৪ সালের ওই নির্বাচনের ভেতর দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে গভীর এক আত্মোপলব্ধির জন্ম হয়। তিনি বুঝতে পারেন যে, এ দেশের মানুষ তাঁকে খুব ভালোবাসে। মানুষের এই ভালোবাসার মূল্য তাঁকে দিতে হবে। মানুষের এই ভালোবাসার প্রেরণা তাঁকে এমনভাবে পরিচালিত করেছে যে তিনি ব্যক্তিগত জীবন সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়েছিলেন। তাঁর কোনো পারিবারিক জীবনও ছিল না। তাঁর প্রতি মুহূর্তের ভাবনা ছিল এ দেশের মানুষকে বঞ্চনামুক্ত করা, দারিদ্র্যমুক্ত করা এবং একটি সুখী-সমৃদ্ধ জীবনের আস্বাদ পাইয়ে দেওয়া। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন :

> একজন মানুষ তার লক্ষ্যের জন্য কষ্ট করতে পারে। আমি আমার জনগণের জন্য কষ্ট করেছি, আমার বাংলাদেশের জন্য দুঃখ সয়েছি। আমার জনগণ আমাকে ভালোবাসে, আমি তা জানি... এটাই আমার কষ্ট সহ্য করার শক্তির উৎস। একজন মানুষ যদি মরতে প্রস্তুত থাকে, তা হলে তাকে মারবে কে?... আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, আমরা তাঁকে আল্লাহ বলি। তিনি আমাকে এই কষ্ট সহ্য করার শক্তি দেন, তিনি মহান।[১৪]

মানুষের ভালোবাসার সঙ্গে তাঁর চরিত্রের আরেকটি অনন্য দিক ছিল, আর তাহলো ধর্মবিশ্বাস। লোক দেখানো ধর্মাচারে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। তিনি ধর্মকে প্রাণের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ধর্মকে কেন্দ্র করে তিনি একটি গভীর আশ্রয় ও প্রশান্তির বলয় নিজের মধ্যেই তৈরি করে নিয়েছিলেন। ফলে তাঁর মধ্যে যে আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়েছিল তার কাছে মৃত্যুভয় তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল। তিনি মানুষের মুক্তি, মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য মৃত্যুকে বরণ করতে সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। তিনি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সব অত্যাচার সহ্য করে নিয়েছিলেন, মাথা পেতে নিয়েছিলেন জেলজুলুম, নিপীড়ন ও নির্যাতন। কিন্তু কিছুতেই পিছপা হননি, অন্য কোনো স্বার্থ তো নয়ই– জীবনের বিনিময়ে হলেও তিনি মানুষের মুক্তির জন্য তাঁর সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। এবং এক জীবনে তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা থেকে চুল পরিমাণও বিচ্যুত হননি। রামেন্দু মজুমদার লিখেছেন :

> নেতৃত্বের একটা অত্যাবশ্যকীয় শর্ত– সাহস। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গানের একটা পঙ্‌ক্তি মনে পড়ছে– 'ওরে ভীরু, তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার।' আমরা লক্ষ করি, ছোটবেলা থেকেই বঙ্গবন্ধু ছিলেন অত্যন্ত সাহসী, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে তিনি কখনো পিছপা হতেন না। এ প্রতিবাদ তিনি করে গেছেন সারাজীবন। বাঙালিদের প্রতি পাকিস্তানিদের অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদের ফলেই তো আমরা লাভ করেছি স্বাধীন বাংলাদেশ। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কতভাবে তাঁকে প্রতিবাদের পথ থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করেছে, কিন্তু সফল হয়নি। অখণ্ড

> পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্বের চেয়ে তাঁর কাছে বড় ছিল বাঙালির অধিকার। ১৯৭১-এর অসহযোগ আন্দোলনের কী পরিণতি হতে পারে, তা নিশ্চয়ই তিনি জানতেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যে আলোচনার নামে সময়ক্ষেপণ করছেন, তা বঙ্গবন্ধু ঠিকই বুঝেছিলেন। কিন্তু তিনি সাহসের সঙ্গে গণতান্ত্রিক পথে অগ্রসর হয়েছেন। পাকিস্তানিদের কোনো সুযোগ দেননি তাঁকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত করার। স্বাধীনতা ঘোষণা করে বীরের মতোই নিজ গৃহে অবস্থান করেছেন, পরিণতি জেনেই। একাত্তরে পাকিস্তানের বন্দিশালায় মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও সাহস হারাননি, আদর্শচ্যুত হননি। বঙ্গবন্ধুর মতো সাহসী নেতারাই তো দেশে দেশে বিপ্লব করেছেন, মানুষকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করার সংগ্রামে নিজেদের উৎসর্গ করেছেন।[১৫]

২৫শে মার্চ ১৯৭১ রাত ৯টার সময় ইয়াহিয়া খান রেডিও মারফত ঘোষণা করেছিলেন, 'Mujib is a traitor to the nation. This time he will not go unpunished.' সুতরাং তাঁকে বন্দি করে পাকিস্তানের কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয় শাস্তি দেওয়ার জন্যই। এবং সেই শাস্তি ছিল তাঁকে হত্যা করা। শেখ মুজিবুর রহমান অনিবার্য মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়েই বন্দি হয়েছিলেন। অথচ ইচ্ছা করলেই তিনি আত্মগোপন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তো কোনো কালেই মৃত্যুভয়ে ভীত ছিলেন না। পাকিস্তানের সামরিক আদালতে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল। তিনি তাতে বিন্দুমাত্র শঙ্কিত হননি। শুধু তাঁর ইচ্ছা ছিল তাঁর মৃতদেহটা যেন বাংলাদেশের মাটিতে সমাহিত করার ব্যবস্থা করা হয়। মৃত্যুদণ্ড স্থগিত রাখা হয়েছিল। বাংলাদেশ যখন মুক্তির পথে, বিজয় যখন সময়ের ব্যাপার মাত্র এবং যখন ইয়াহিয়া গদিচ্যুত, তখন তিনি ভুট্টোকে রায় কার্যকর করার জন্য বলেছিলেন। সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন 'বঙ্গবন্ধু : ইতিহাসের মহানায়ক' নামক একটি প্রবন্ধে লিখেছেন :

> ভুট্টো সাহেব রাজি হননি। রাজি হননি আন্তর্জাতিক চাপে। রাজি হননি মার্কিন সরকারের চাপে। রাজি হননি তাদের দোসরদের জান বাঁচাবার জন্য। রাজি হননি এক লক্ষ পাকিস্তানি সৈন্যকে রক্ষা করবার জন্য। তাই সেদিন তাঁর প্রাণরক্ষা পেয়েছিল। কিন্তু মৃত্যুদণ্ড স্থগিত ছিল। পরে কার্যকর হবে, যেদিন তাদের মতলব হাসিল হয়ে যাবে সেদিন কার্যকর হবে। তা-ই হয়েছিল। ইয়াহিয়ার সেই কথা কার্যে পরিণত হয়েছিল। ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে পাকিস্তানের সামরিক আদালতে তাঁকে যে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছিল তা কার্যকর করা হয়েছিল চার বছর পরে ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসে।[১৬]

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের ভোরে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশের স্থপতি, বাঙালির জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়। দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে কিছু বিপথগামী ও উচ্চাভিলাষী বিশ্বাসঘাতক সেনা অফিসারদের হাতে তিনি সপরিবার নিহত হন। সেই সময় তিনি কী বলেছিলেন তা আজও জানা যায়নি। তবে খুনি ফারুকের এক সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, বঙ্গবন্ধুকে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়েছিল। তিনি আত্মসমর্পণ করেননি।[১৭] বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায়, সেনাবাহিনীর খুনি অফিসারদের সঙ্গে শেষ মুহূর্তেও তিনি তাঁর সাহসিকতা, মনোবল ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আচরণ করেছেন এবং তাঁর বজ্রকণ্ঠের হুংকারে খুনিরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

বঙ্গবন্ধু আমাদের মাঝে নেই। পঞ্চান্ন বছরের একটি ছোটো জীবন উৎসর্গ করে আমাদের একটি স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র উপহার দিয়ে তিনি চলে গেছেন। তিনি কোনো কিছুই অপরিপূর্ণ রেখে যাননি। যে সংবিধান তিনি দিয়ে গেছেন তা একটি আধুনিক ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র গঠনের জন্য অসাধারণ সংহিতা। সাড়ে তিন বছরের রাষ্ট্রক্ষমতায় থেকে একটি সমন্বিত উন্নয়নের যে পথ তিনি দেখিয়ে গেছেন তা যে-কোনো সময়ে রাষ্ট্র পরিচালনার পাথেয় হতে পারে। জাতীয়তাবাদী জীবনাদর্শ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, সম্পদের সুষম বণ্টন ও অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রকাঠামোর যে আদর্শ তিনি আমাদের মাঝে রেখে গেছেন তাঁর পরিচর্যার ভেতর দিয়ে আমরা বিশ্বের আধুনিক, উন্নত ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্রের উচ্চতায় পৌঁছতে পারি। গত এক যুগে সেই লক্ষ্যে আমরা অনেকটা পথ অতিক্রম করেছি। কিন্তু এসবের ঊর্ধ্বে তিনি আমাদের জন্য, বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য, পৃথিবীর মুক্তিকামী প্রতিটি মানুষের জন্য যে জীবনাদর্শ রেখে গেছেন তাহলো তাঁর সাহসিকতা, মানুষের জন্য অফুরন্ত ভালোবাসা, মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের নিরন্তর পাঠ। তাঁর এই জীবনাদর্শ অনুসরণ করে আমরা মানবিক মূল্যবোধে ঋদ্ধ মানুষ হয়ে উঠতে পারি।

তথ্যসূত্র

১. https://www.newworldencyclopedia.org/entry/courage
২. https://www.newworldencyclopedia.org/entry/courage
৩. https://www.emotionalcompetency.com/papers/Moral_Courage_Definition_and_Development.pdf
৪. এস এ করিম 'শেখ মুজিবের বীরত্ব ও মানবিকতা', *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৪ই আগস্ট ২০১৫
৫. https://www.umcvc.org/health-library/aa150174
৬. এস এ করিম 'শেখ মুজিবের বীরত্ব ও মানবিকতা', *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৪ই আগস্ট ২০১৫। Sayyid A. Karim রচিত *Sheikh Mujib: Triumph and Tragedy* (The University Press Limited, 2005) গ্রন্থের উপসংহারের অনুবাদ করেছেন প্রতীক বর্ধন।
৭. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* (দি ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা : প্রথম প্রকাশ জুন ২০১২, অষ্টম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৮), পৃ. ৮
৮. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০
৯. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২
১০. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, প্রাগুক্ত
১১. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
১২. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০
১৩. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫-২৫৬
১৪. উদ্ধৃত, এস এ করিম, 'শেখ মুজিবের বীরত্ব ও সাহসিকতা', *প্রথম আলো*, ১৪ই আগস্ট ২০১৫
১৫. রামেন্দু মজুমদার, 'অসাম্প্রদায়িক ও মানবিকতার মূর্ত প্রতীক', *কালি ও কলম*, ১৮ই জানুয়ারি ২০২০
১৬. সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন, 'বঙ্গবন্ধু : ইতিহাসের মহানায়ক', *কালি ও কলম*, ২৫শে জানুয়ারি ২০২০
১৭. অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, *ফ্যাক্টস্ এন্ড ডকুমেন্টস্ বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড* (চারুলিপি প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৬, দশম মুদ্রণ, ২০১৯), পৃ. ১২৯

প্রফেসর ড. সরকার আবদুল মান্নান: সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ

জেল হত্যাকাণ্ড: কলঙ্কিত পঁচাত্তর এবং ইতিহাসের দায় শোধ

মুস্তাফা মাসুদ

বাংলাদেশের তিনটি অবিস্মরণীয় ঘটনা ইতিহাসের অনিবার্য সঞ্চয় হয়ে আছে। দ্বিমাত্রিক এই তিনটি ঘটনার মধ্যে প্রথমটি হলো আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং বাঙালির স্বাধীনতা অর্জন। দ্বিতীয় ঘটনাটি হলো ১৯৭৫ সালের পনেরোই আগস্ট কালরাতে স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবার হত্যা এবং তৃতীয় ঘটনাটি হলো একই সালের ৩রা নভেম্বর জেলখানার অভ্যন্তরে জাতীয় চার নেতা হত্যা। দ্বিমাত্রিক বললাম এই কারণে যে, একটি ঘটনা অর্জনের, আনন্দের আর দুটি ঘটনা বিষাদের কান্নায় একাকার। প্রথম ঘটনাটি একসাগর রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন; এক আলোকময় গৌরবের শৈলচূড়ায় আরোহণ। অগণিত জীবন আর অপরিসীম ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সেই স্বাধীনতা পরিণতিতে এক আনন্দেরই অক্ষয় স্মৃতিসৌধ; বলা যেতে পারে– রক্তের পটভূমিতে বিজয়ের ঐতিহাসিক উদ্‌বোধন। কিন্তু পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট আর তেসরা নভেম্বর জাতি কী দেখল! ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বর থেকে বকশিবাজারের জেলখানা। মাত্র তিন মাসেরও (৭৮ দিন) কম সময়ের ব্যবধানে দুই ঠিকানায় দুটি লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টে ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বর রোডের বাড়িতে সপরিবার বঙ্গবন্ধু হত্যা এবং একই সালের ৩রা নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে জাতীয় চার নেতা– মুক্তিযুদ্ধকালীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ওই সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, অর্থমন্ত্রী ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসনমন্ত্রী এএইচএম কামারুজ্জামানকে হত্যা–এই দুই হত্যার উদ্দেশ্য বা মোটিভ একই প্রেক্ষাপট থেকে উদ্ভূত। এই ঘটনা দুটির কালো হাত প্রলম্বিত হয়েছিল অনেক দূর পর্যন্ত। স্মরণীয় প্রথম ঘটনাটি অর্থাৎ এই উপমহাদেশে বাংলাদেশ নামের একটি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় কোনো মামুলি ঘটনা ছিল না। এত রক্তপাত, প্রাণহানি, অবর্ণনীয় ত্যাগ-তিতিক্ষার পরও আমরা সেদিন বিজয়ের আনন্দে উদ্বেলিত হয়েছিলাম, এখনো হই। কেন? কারণ, পর্বতসমান বিষাদের শীর্ষচূড়ায় বিজয়ের যে স্বাধীন পতাকা উড্ডীন হয়েছিল, সেটি আমাদের অস্তিত্বের চেয়েও বেশি কিছু। সব কিছুর ওপরে দেশ, দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব। ঐতিহাসিক এক মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমেই স্বকীয়তা এবং স্বাধীনতা আমাদের নিজের হয়েছিল। একটি প্রবল শক্তিমান সামরিক শক্তিকে মিত্র বাহিনীর সক্রিয় সহায়তা-সমর্থনে মাত্র নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে তছনছ করে দেওয়ার ফলে আমরা যেমন বিজয় অর্জন করি, তেমনি সেই যুদ্ধে পর্যুদস্ত বাহিনী এবং তাদের সুহৃদ-মিত্ররা অপমানের জ্বালা ভুলতে পারেনি। তাদের ক্ষোভ আর প্রতিশোধ স্পৃহার বহুমাত্রিক যোগফলের মধ্য থেকে যে বিষবৃক্ষের জন্ম হয়, তা বহু শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হয়; অসাম্প্রদায়িক আবহের ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশে সমান্তরালভাবে আরেক বেপথু, উগ্রবাদী এবং ককটেল সমাজ-সংস্কৃতির দাপুটে বিস্তারকে আবাহন করে সেসময়।

পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যা এবং ৩রা নভেম্বরে জাতীয় চার নেতা হত্যা–এই দুটি ঘটনা ওই বেপথু-উগ্রবাদীদের সামনে সুবর্ণ সুযোগ এনে দিলো। বলা যায়, আরও বহুমাত্রিক সুযোগের দ্বার উন্মুক্ত করে দিলো। বঙ্গবন্ধুর শাহাদতের পরেও খুনিরা এবং তাদের দোসর-মিত্ররা নিজেদের অবৈধ পথকে নিষ্কণ্টক ও নিরাপদ মনে করছিল না বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য সহকর্মী জাতীয় চার নেতার শরীরী উপস্থিতির কারণে। যদিও তাঁরা তখন জেলে অন্তরিন, তবুও মোশতাক গং সব সময় তাঁদেরকে নিয়ে আতঙ্কে তটস্থ ছিল। ওই চক্র অনেককে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার টোপ দেয়। কেউ কেউ সেই টোপ গিলেও ফেলে। অনেকে সেদিন খুনিদের সঙ্গে আঁতাত করে প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে। কিন্তু সিংহহৃদয় জাতীয় চার নেতা অবৈধ মোশতাককে সমর্থন করলেন না। তার সঙ্গে হাত মেলালেন না। আর তখনি তাঁদের ভয়াবহ নিয়তি নির্ধারিত হয়ে যায়। কারাগারে বন্দি নেতাদেরকেও খুনিচক্র তাদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ মনে করল। বেঁচে থাকলে সময়-সুযোগ মতো আবারও তাঁরা জনগণকে সুসংগঠিত করবেন। ফিরিয়ে আনবেন মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশের আদর্শকে। তখন অবৈধ ক্ষমতার বালিরবাঁধ কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে দুর্বার গণজোয়ারে! তাছাড়া তাঁদের অবর্তমানে বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারায় পরিচালনা করার মতো যোগ্য নেতাও থাকবে না– ভেবেছিল তারা। ধূর্ত মোশতাক আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা তাই আর দেরি করেনি। সব আইন-নীতি-নিয়ম-লাজলজ্জা আর ন্যূনতম মানবিকতাবোধকে বিসর্জন দিয়ে কারাগারের বদ্ধ ঘরে চারটি নিরস্ত্র মানুষকে গুলি করে হত্যা করা হলো দানবীয় বীভৎসতায়! ঘাতকেরা তাঁদেরকে শুধু গুলি করে হত্যা করেই সন্তুষ্ট হতে পারেনি; তারা জাতীয় চার নেতার মৃতদেহ বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে এবং এভাবে চরম নারকীয় বর্বরতা চালায় জাতির চার সূর্যসন্তানের ওপর! সদাপ্রহরাধীন কারাগারের নিরাপদ প্রকোষ্ঠে এমন নৃশংস হত্যার ঘটনা বিশ্ববিবেককে আন্দোলিত করল। জানা যায়, পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী নায়েক রিসালদার মোসলেম উদ্দীনের নেতৃত্বে একদল ঘাতক চার নেতাকে হত্যা করতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে যায়। তারা মোশতাক-ফারুক-রশিদ-ডালিম গংয়ের নির্দেশেই সেখানে যায় এবং তাদের ওপর অর্পিত 'দায়িত্ব'

পালন করে। তথাকথিত রাষ্ট্রপতি মোশতাক খুনিদের 'সূর্যসন্তান' হিসেবে আখ্যায়িত করে।

জেল হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনাকারীদের উদ্দেশ্য ছিল সুদূরপ্রসারী। মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা যে অসাম্প্রদায়িক উদার মানবিক ধ্যান-ধারণার লালন-পোষণ, তাকে নির্বাসনে পাঠানো এবং সদ্য স্বাধীন দেশটাকে পুনরায় মৃত পাকিস্তানের কঙ্কালের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে তাতে পুরনো ধ্যান-ধারণার পুনরুজ্জীবন ঘটানো। আর সেজন্য প্রথমে প্রয়োজন ছিল সেসব মানুষগুলোকে সরিয়ে দেওয়া, যাঁরা স্বাধীন বাংলাদেশের প্রকৃত চেতনা ও প্রাণপ্রবাহকে ধারণ করেন নিজেদের মধ্যে– কোনো বৈরী ঝড়-ঝঞ্ঝাই তাঁদেরকে টলাতে পারে না। এই অনমনীয় আদর্শকে ধারণ ও লালন করার 'অপরাধেই' বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচর চার নেতাকে প্রাণ দিতে হলো কারান্তরালে। তাঁরা জীবন দিলেন, কিন্তু ইতিহাসের উলটো রথের সারথিদের সঙ্গে আপোশ করেননি। তাঁরা রক্ত দিয়ে একদিকে জাতির পিতার রক্তদানকে আরও মহিমান্বিত, আরও তাৎপর্যময় করে তোলেন; অন্যদিকে অন্যায়ের কাছে মাথানত না করে মুক্তিযুদ্ধের মহিমা ও স্বাধীন বাঙালি জাতির মর্যাদাকে আরও সমুন্নত করে গেছেন। আর তাইতো তাঁরা বাংলার ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। মহান নেতা বঙ্গবন্ধুর পাশাপাশি জাতি তাঁদেরকেও স্মরণ করে অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায়। আর যারা সেদিন বঙ্গবন্ধু হত্যাসহ জেলখানায় জাতীয় চার নেতার হত্যায় জড়িত ছিল, সমর্থন দিয়েছিল কিংবা নিষ্ক্রিয় ছিল অথবা খুনিচক্রের সঙ্গে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় হাত মিলিয়েছিল, জাতি তাদেরকেও ভোলেনি। তাদের প্রতি জাতির ক্ষোভ, ঘৃণা আর নিন্দাবাদ আজও বর্ষিত হয়। জাতির নিন্দা আর অভিশাপ মাথায় নিয়েই তাদের অনেকে বঙ্গবন্ধু হত্যার অভিযোগে ফাঁসির দড়িতে ঝুলেছে; খোন্দকার মোশতাক নিজগৃহে স্বেচ্ছানির্বাসিত অবস্থায় অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ হয়ে ১৯৯৬ সালের ৫ই মার্চ মৃত্যুবরণ করে; আর বেশ কয়েকজন ঘাতক অপরাধের বোঝা মাথায় নিয়ে বিদেশে পলাতক জীবনযাপন করছে–এদের একজন আবার বিদেশেই মারা গেছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, জেলখানায় জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করার আগে স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট মোশতাক এবং ফারুক-রশিদ-ডালিমদের বিরুদ্ধে একটা শক্ত প্রতিরোধ গড়ে ওঠে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষের সেনা অফিসারদের দ্বারা। তৎকালীন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ, ব্রিগেডিয়ার শাফায়েত জামিল প্রমুখ সেনা কর্মকর্তা বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী ও সেই হত্যাকাণ্ডের অন্যতম প্রধান পরিকল্পনাকারী খোন্দকার মোশতাককে রাষ্ট্রপতি বানিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী সেনা কর্মকর্তাদের সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলাবিরোধী আচরণকে কঠোরভাবে রুখে দিতে, সেইসঙ্গে বিদ্যমান স্বৈরাচারী ব্যবস্থার অবসানে তৎপর হন। ফারুক-রশিদ গং তখন এতটাই বেপরোয়া হয়ে ওঠে যে, কোনো দাপ্তরিক পজিশন ছাড়াই তারা ডজনখানেক ট্যাংক নিয়ে বঙ্গভবনের অভ্যন্তরে অবস্থান করতে থাকে। এছাড়া আরও বারোটি ট্যাংক মোতায়েন করে রমনা রেসকোর্স ময়দানে, যা বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান নামে পরিচিত। আরও দশটি ট্যাংক ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে মোতায়েন রাখে সদাপ্রস্তুত অবস্থায়। এর অর্থ এই যে, এসব ট্যাংক ও পদাতিক ইউনিট মূল সেনা নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল এবং সেগুলো সর্বতোভাবেই ফারুক-রশিদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এসব ইউনিটের ওপর সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এমনকি মোশতাকের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা জেনারেল এমএজি ওসমানীর কোনো নিয়ন্ত্রণই ছিল না। অন্যদিকে ডালিম, নূর ও শাহরিয়ার গং তাদের অধীন কিছু সশস্ত্র সৈন্য নিয়ে বাংলাদেশ বেতার ভবনের অভ্যন্তরে অবস্থান নেয়।

২রা নভেম্বর ১৯৭৫। জেল হত্যাকাণ্ডের ঠিক আগের দিন। বিদ্রোহী ও সেনা শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ব্রিগেডিয়ার শাফায়েত জামিলের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর ৪৬তম ব্রিগেড দ্রুত অ্যাকশনে নেমে পড়ে। তারা বঙ্গভবনের অভ্যন্তরে অবস্থান নেয়, বাংলাদেশ বেতারের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে ও এর সম্প্রচার বন্ধ করে দেয় এবং বিদ্রোহীদের সম্ভাব্য ট্যাংক আক্রমণ অকার্যকর করার লক্ষ্যে অন্যান্য কৌশলগত সকল অবস্থানে পজিশন নেয়।

৩রা নভেম্বর ১৯৭৫। সকালবেলা। বিমানবাহিনীর কয়েকটি ফাইটার জেট প্লেন ভীতিজনকভাবে বঙ্গভবনের ওপর দিয়ে আকাশে উড়তে থাকে। অবস্থা বেগতিক দেখে মোশতাক ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বাধীন সমঝোতাকারী দলের সঙ্গে বৈঠকে এক সমঝোতায় আসে। সমঝোতা অনুযায়ী ফারুক-রশিদ গং আত্মসমর্পণ এবং দেশত্যাগ করতে সম্মত হয়। কিন্তু ইতোমধ্যে ৩রা নভেম্বর রাতে খুনি রশিদ এবং অন্য খুনিদের সহায়তায় মোশতাক তার আসল কাজটি সেরে ফেলে– কারাভ্যন্তরে জাতীয় চার নেতাকে নির্মমভাবে হত্যা করার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করে। এসময় তারা বুঝে ফেলেছিল যে, তাদের সময় শেষ। তাই শেষ কামড়টি দিলো তারা জাতির আশাহত বুকে। যোগ্য নেতার অভাবে দেশ যেন চিরতরে মুখ থুবড়ে পড়ে বিভ্রান্তি আর জগাখিচুড়ির নোংরা নর্দমায়, সেটি পাকাপোক্ত করার জন্যই খুনিরা জাতির চার ধ্রুবতারাকে হত্যা করে। হত্যা মিশন সম্পন্ন হওয়ার পর সে রাতেই খুনিরা বিমানে ব্যাংককের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করে। বঙ্গবন্ধুর পর জাতীয় চার নেতাকে হত্যার মধ্য দিয়ে উদার অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের শেষ সম্ভাবনাটুকুও যেন তিরোহিত হয়ে গেল। এখানে আমরা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করি যে, ৩রা নভেম্বর মোশতাক গং যে উদ্দেশ্যে জেল হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল, তার সাথে পুরোপুরি সাদৃশ্য পাওয়া যায় একাত্তরে বুদ্ধিজীবী হত্যার উদ্দেশ্যের। পাকিস্তানি হানাদার আর তাদের দোসর আলবদর বাহিনী একাত্তরে চেয়েছিল জ্ঞানী-গুণীদের হত্যা করে দেশকে মেধাশূন্য করতে; বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে পঙ্গু করতে। অনুরূপভাবে পঁচাত্তরের খুনিরাও চেয়েছিল মেধাবী ও দেশপ্রেমিক শীর্ষ রাজনীতিবিদগণকে হত্যা করে রাজনীতির ময়দান মেধাশূন্য করতে। তারা কেউ পাকিস্তানি ছিল না; বাঙালি হয়েই তারা একাত্তরের ঘাতকদের মতোই অপকর্ম করল। একাজে তারা অনেকটাই সফল হয়েছিল। পঁচাত্তর-পরবর্তী রাজনীতির ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য-চারিত্র্য পর্যবেক্ষণ-বিশ্লেষণ করলে সহজেই আমরা তা বুঝতে পারি।

পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট-পরবর্তী বৈরী ঝড়ো সময়গুলোতে বঙ্গবন্ধু হত্যার মতো ৩রা নভেম্বরের জেল হত্যাকাণ্ডের তদন্ত আর বিচারও নানান ষড়যন্ত্র আর হিপোক্রেসির কানাগলিতে আটকে ছিল। সেসময় লালবাগ থানায় জেল হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে একটি মামলা দায়ের হয়। কিন্তু দীর্ঘ একুশ বছর– ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার আগ পর্যন্ত তার তদন্ত ও বিচারকাজ আর এগোয়নি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠিত হওয়ার পর জেল হত্যা মামলা আবার চালু করা হয়। আট বছর বিচার চলার পর ২০০৪ সালের ২০শে অক্টোবর এই মামলার রায় হয়। অভিযুক্ত বিশ সাবেক সেনা কর্মকর্তার মধ্যে ১৫ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালত রায় প্রদান করে। এদের মধ্যে তিনজনকে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড এবং ১২ জনকে

যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়; পাঁচজনকে খালাস দেওয়া হয়। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তরা হলো: দফাদার মারফত আলী শাহ, সার্জেন্ট মোসলেম উদ্দীন ওরফে হিরন খান এবং এলডি দফাদার মোহাম্মদ আবুল হাশেম মৃধা। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্তরা হলো: কর্নেল (অব.) ফারুক রহমান, কর্নেল (অব.) সৈয়দ শাহরিয়ার রশিদ, মেজর (অব.) বজলুল হুদা, লে. কর্নেল (বরখাস্ত) খোন্দকার আবদুর রশিদ, লে. কর্নেল শরিফুল হক ডালিম, লে. কর্নেল (অব.) এসএইচএমবি নূর চৌধুরী, লে. কর্নেল (অব.) একেএম মহীউদ্দীন আহমেদ, লে. কর্নেল (অব.) এএম রাশেদ চৌধুরী, মেজর (বরখাস্ত) আহমেদ শরিফুল হোসাইন, ক্যাপ্টেন (অব.) আবদুল মাজেদ, ক্যাপ্টেন (বরখাস্ত) মোহাম্মদ কিসমত হোসাইন এবং ক্যাপ্টেন (অব.) নাজমুল হোসাইন আনসার। যে পাঁচজনকে খালাস দেওয়া হয় তারা হলো: কেএম ওবায়েদুর রহমান, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, তাহেরউদ্দীন ঠাকুর, নুরুল ইসলাম মঞ্জুর এবং মেজর (অব.) খায়রুজ্জামান। আসামিরা উচ্চ আদালতে আপিল করলে ২০০৮ সালের ২৮শে আগস্ট আপিলের রায় হয়। এই রায়ে কেবল সার্জেন্ট মোসলেম উদ্দীনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখা হয় আর নিম্ন আদালতে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অন্য দুই অভিযুক্ত দফাদার মারফত আলী শাহ ও এলডি দফাদার মোহাম্মদ আবুল হাশেম মৃধাকে খালাস দেওয়া হয়।

এছাড়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে অন্যতম চার অভিযুক্ত লে. কর্নেল (বরখাস্ত) সৈয়দ ফারুক রহমান, লে. কর্নেল (অব.) শাহরিয়ার রশিদ, মেজর (অব.) বজলুল হুদা ও লে. কর্নেল একেএম মহীউদ্দীন আহমেদকেও মামলা থেকে খালাস দেওয়া হয়। চার অভিযুক্ত ব্যক্তির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড সংক্রান্ত নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে করা চারটি আপিল আবেদন নিষ্পত্তি করে বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরী ও বিচারপতি আতাউর রহমান খানের হাইকোর্ট বেঞ্চ উক্ত নতুন রায় প্রদান করে। এই রায় স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে অনেক বিলম্বে ঘোষিত হলেও শহিদ জাতীয় চার নেতাদের পরিবার-পরিজন এবং অন্যান্য সূত্র থেকে এই বিচারকে 'রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট' ও 'প্রহসন' বলে অভিহিত করে এই বিচারের রায়কে প্রত্যাখ্যান করা হয়। তারা অভিযোগ করেন যে, এতে জেল হত্যা ষড়যন্ত্রের মূল পরিকল্পনাকারীদের কাউকেই শাস্তি দেওয়া হয়নি। তারা জাতীয় ইতিহাসের এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের পুনরায় তদন্ত ও বিচার দাবি করেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, জেল হত্যার অভিযোগ থেকে খালাস পেলেও বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় অভিযুক্ত চার আসামি লে. কর্নেল (বরখাস্ত) সৈয়দ ফারুক রহমান, লে. কর্নেল (অব.) শাহরিয়ার রশিদ খান, মেজর (অব.) বজলুল হুদা ও লে. কর্নেল একেএম মহীউদ্দীন আহমেদের ফাঁসি কার্যকর করা হয় ২০১০ সালের ২৭শে জানুয়ারি। ২০০৮ সালের ২৯শে ডিসেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে চৌদ্দ দলীয় জোট বিপুলভাবে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। এর ফলে জেল হত্যা মামলা পুনর্বিচারের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আপিল করা হয়। ফলে পুনর্বিচারের কার্যক্রম পুনরায় শুরু হয়। আপিল বিভাগ ২০১৪ সালের ৩০শে এপ্রিল এক সংক্ষিপ্ত রায়ে পূর্বে প্রদত্ত হাইকোর্টের রায় বাতিল করে দেয় এবং ২০০৪ সালে প্রদত্ত নিম্ন আদালতের রায় বহাল রাখে; অর্থাৎ নিম্ন আদালতে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত তিন আসামির মৃত্যুদণ্ড এবং বারো আসামির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বহাল রাখে। ছয় সদস্যবিশিষ্ট সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ জেল হত্যাকাণ্ড মামলার রায়ে উল্লেখ করে যে, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রই ঘাতকদেরকে অনুপ্রাণিত করে কারাভ্যন্তরে এমন ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ড ঘটাতে। নিহত এই জাতীয় নেতৃবৃন্দ প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রীয় হেফাজতে ছিলেন এবং এমন একটি দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া খুবই দুষ্কর যে, শান্তিপূর্ণ অবস্থায় একটি সরকার নির্দিষ্ট ব্যক্তিদেরকে– যাদের এহেন কাপুরুষোচিত হত্যাকাণ্ড ঘটানোর কোনো আইনগত কর্তৃত্ব নেই– নির্দেশ দিয়েছে বা উৎসাহিত করেছে। সুতরাং যে কেউ নির্দ্বিধায় বলতে পারে যে, এটি ছিল আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতার অর্জনগুলোকে ধ্বংস করার এক সুপরিকল্পিত পদক্ষেপেরই অংশ। খুনিরা যে ষড়যন্ত্রকারীদের স্বার্থে এমন অপরাধমূলক কাজ করেছিল, সেই ষড়যন্ত্রকারীরা এমনভাবে পরিকল্পনা এঁটেছিল, যাতে এ দেশের জনগণ যে উদ্দেশ্যে মুক্তিযুদ্ধ করেছিল এবং স্বপ্ন দেখেছিল– তার সবটাই ধ্বংস হয়ে যায়। পঁচাত্তরের ৩রা নভেম্বরের জেল হত্যাকাণ্ডের ছেচল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। দোষীদের বিচারের চূড়ান্ত রায়ও ঘোষিত হয়েছে ইতোমধ্যে। কিন্তু অভিযুক্ত ঘাতকদের সবার সাজা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। কারণ, তারা এখনো বিদেশে পালিয়ে রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের মতো জেল হত্যাকাণ্ডেরও চূড়ান্ত রায় জাতি পেয়েছে। এর ফলে জাতির ক্রুদ্ধ-আহত বিবেকের ওপর চেপে থাকা ঐতিহাসিক দায়ভার অনেকটা লাঘব হয়েছে। এখন বিদেশে পালিয়ে থাকা অবশিষ্ট ঘাতকদের দেশে এনে সর্বোচ্চ আদালতের রায় কার্যকর করা জরুরি। বর্তমান সরকার সেই লক্ষ্যে জোরালো কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে।

আমরা আশা করি, নূর চৌধুরীকে দেশে ফিরিয়ে এনে রায় কার্যকর করা সম্ভব হবে। আমরা আরও আশা করি, ন্যায় ও মানবতার খাতিরে লিবিয়া, পাকিস্তান বা অন্য কোনো দেশই খুনিদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেবে না। তাদের সবাইকে দেশে এনে সর্বোচ্চ আদালতের দেওয়া সাজা কার্যকর করতে পারলে জাতি যেমন পুরোপুরি কলঙ্কমুক্ত হবে, শোধ হবে ইতিহাসের দায়, তেমনি শহিদদের স্বজনরা পাবেন সান্ত্বনা; শহিদদের বিদেহী আত্মাও তাতে শান্তি পাবে।

তথ্যসূত্র

১. https://www.albd.org (বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নিজস্ব ওয়েব সাইট)

২. Bangladesh-kothai-jai.blogspot.com

৩. Jail Killing Day: Wikipedia, the free encyclopedia

৪. www.thedailystar.net

৫. https://www.bbc.com/bengali/news-41856101,3 November, 2017; update- 3rd November, 2020

মুস্তাফা মাসুদ: শিশু সাহিত্যিক

ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

পাবলিক প্লেসে ধূমপান দণ্ডনীয় অপরাধ।

জেল হত্যা

বঙ্গবন্ধুর আদর্শের নেতৃত্বকে নিশ্চিহ্ন করার অপচেষ্টা

মো. মামুন অর রশিদ

বাংলাদেশের কারাগারের স্লোগান হচ্ছে– 'রাখিবো নিরাপদ, দেখাবো আলোর পথ'। এই স্লোগানের সঙ্গে জেল হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। কয়েদিদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হচ্ছে জেলখানা। আর সেই আশ্রয়স্থলে যদি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান ব্যক্তির নির্দেশে কয়েদিদের গুলি করে ও বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করা হয়, তাহলে রাষ্ট্রের নিয়মরীতি ও মানবতা বলতে কি কিছু থাকে?

১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর এমনি একটি নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। হত্যা করা হয় জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী এবং এএইচএম কামারুজ্জামানকে। এই জাতীয় চার নেতা কোনো সাজাপ্রাপ্ত কয়েদি ছিলেন না। তাঁরা বঙ্গবন্ধুর আদর্শ লালন করতেন বলে তাঁদের ঠাঁই হয় জেলখানায়।

একটি নির্মম বাস্তবতা হলো, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি প্রতিপক্ষ ছিল। আর প্রতিপক্ষরা হচ্ছে দেশি ও বিদেশি মিতালি শক্তি। সদ্য স্বাধীন দেশে বিজয়ের আনন্দে বিজয়ীরা যখন আনন্দে উদ্বেলিত, তখন পরাজিত শক্তি পুনরায় সংগঠিত হওয়ার জন্য মরিয়া ছিল। এটাই ইতিহাসের অমোঘ সাক্ষ্য।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতাকে নৃশংসভাবে হত্যা করেই শুধু হত্যাকারীরা ক্ষান্ত হয়নি, হায়েনারা নারী, শিশু হত্যার মতো জঘন্য অপরাধও সংঘটিত করেছে। ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ড বিশ্লেষণ করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতার রক্তধারাকে বাংলাদেশ থেকে ঘাতকরা চিরতরে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল। শুধু তাই নয়, বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে যাঁরা লাল-সবুজের পতাকা বহন করতে পারে, তাঁদেরকেও নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। ষড়যন্ত্রকারীরা সাময়িকভাবে সফলও হয়েছিল।

যেভাবে জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করা হয়

১৯৭৫ সালের নভেম্বরে ঢাকা শহর ছিল অস্থিরতার নগরী। ঐ সময় সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে অভ্যুত্থান এবং পালটা অভ্যুত্থান নিয়ে নানারকম কথা বাতাসে ভাসছিল। ৩রা নভেম্বর রাত আনুমানিক দেড়টা থেকে দুইটার দিকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনে একটি পিকআপ এসে থামে। সেসময় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে জেলার হিসেবে কর্মরত ছিলেন আমিনুর রহমান। রাত দেড়টার দিকে কারা মহাপরিদর্শক টেলিফোন করে জেলার আমিনুর রহমানকে তাৎক্ষণিকভাবে আসতে বলেন। দ্রুত কারাগারের মূল ফটকে গিয়ে আমিনুর রহমান দেখলেন, একটি পিকআপে কয়েকজন সেনা সদস্য সশস্ত্র অবস্থায় আছে। এর কিছুক্ষণ পর তাঁর কার্যালয়ের টেলিফোনটি বেজে ওঠে। আমিনুর রহমান যখন টেলিফোনের রিসিভারটি তুললেন, তখন অপর প্রান্ত থেকে বলা হলো প্রেসিডেন্ট কথা বলবেন।

২০১০ সালে বিবিসি বাংলার কাছে সে ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে আমিনুর রহমান বলেন, 'টেলিফোনে বলা হলো প্রেসিডেন্ট কথা বলবে আইজি সাহেবের সাথে। তখন আমি দৌড়ে গিয়ে আইজি সাহেবকে খবর দিলাম। কথা শেষে আইজি সাহেব বললেন যে প্রেসিডেন্ট সাহেব ফোনে বলছে আর্মি অফিসাররা যা চায়, সেটা তোমরা করো।'

রাত প্রায় তিনটা পর্যন্ত কারাগারের মূল ফটকের সামনে কথাবার্তা চলতে থাকে। এক পর্যায়ে কারাগারে থাকা তৎকালীন আওয়ামী লীগের চার নেতাকে একত্রিত করার নির্দেশ আসে। এরপর কারা মহাপরিদর্শক জেলার আমিনুর রহমানের হাতে চারজনের নাম লেখা একটি চিরকুট ধরিয়ে দিয়ে বলেন, এদেরকে এক জায়গায় করো। সেই চারজন হলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী এবং এএইচএম কামারুজ্জামান। এই চার নেতাকে দ্রুত একত্রিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

জেল হত্যাকাণ্ডের সময় জাতীয় চার নেতার সাথে কারাগারে ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া। জেল হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরীর বর্ণনা অনুযায়ী, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের একটি বিল্ডিংয়ের এক নম্বর কক্ষে ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দীন আহমদসহ আট জন। দুই নম্বর কক্ষে ছিলেন এএইচএম কামারুজ্জামান, মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়াসহ ৮/৯ জন। তিন নম্বর কক্ষে ছিলেন এম মনসুর আলী, আব্দুস সামাদ আজাদ, আমির হোসেন আমুসহ প্রায় ১২ জন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দীন আহমদকে তাঁদের কক্ষে রেখে বাকি কয়েদিদের কক্ষ থেকে বের করে দেওয়া হয়। অন্য দুটি কক্ষ থেকে এএইচএম কামারুজ্জামান এবং এম মনসুর আলীকে এক নম্বর কক্ষে নিয়ে আসা হয়। তারপর জাতীয় চার নেতাকে একসাথে ব্রাশ ফায়ার করা হয়। ব্রাশ ফায়ার করার পর ঘাতকরা চলে যায়। তিনজন নেতা তাৎক্ষণিকভাবে

মৃত্যুবরণ করলেও একজন মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন। এ খবর পেয়ে ঘাতকরা জেল গেট থেকে এসে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জাতীয় চার নেতার মৃত্যু নিশ্চিত করে। এভাবে নৃশংসভাবে জাতীয় চার বীর সন্তানকে হত্যা করা হয়।

জেলখানায় তাজউদ্দীন আহমদ একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাজউদ্দীন আহমদ স্বপ্নের বর্ণনা দেন এভাবে– 'বঙ্গবন্ধু আমাকে একটি কালো গাড়িতে তুলে বলেন, টুঙ্গিপাড়ায় যেতে হবে। আমি বুঝেছি, আমার সময় বেশি নাই আর। আমাকে যখন ডাক দিয়েছে, নিয়েই যাবে।' ৭/৮ দিন পর ঠিক একই ধরনের একটি স্বপ্ন দেখেন এম মনসুর আলী। এই দুটি স্বপ্ন থেকে তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁদের আর বেশি দিন সময় নেই। ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর তাঁদের সময় শেষ হয়ে যায়।

জাতীয় চার নেতাকে হত্যার কারণ

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর আওয়ামী লীগের মধ্যে নেতৃত্ব সংকট সৃষ্টি হয়। বঙ্গবন্ধুর পর এই চার জাতীয় নেতা ছিলেন দলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ১৫ই আগস্টের পর চার জাতীয় নেতাসহ জ্যেষ্ঠ অনেক নেতা ছিলেন কারাগারে এবং কেউ কেউ ছিলেন আত্মগোপনে। বাকি আওয়ামী লীগ নেতারা প্রকাশ্য কিংবা অপ্রকাশ্যে খোন্দকার মোশতাক আহমদের সাথে সমঝোতা করেন। অনেক নেতা আবার রাজনীতিতে নিষ্ক্রিয় হয়ে যান।

জেল হত্যাকাণ্ডের মূল কারণ হলো বঙ্গবন্ধুর আদর্শের নেতৃত্বকে নিশ্চিহ্ন করা। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার হত্যা করে ক্ষমতা দখল করার পরেও ঘাতকরা নিজেদের নিরাপদ ভাবতে পারেনি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর থেকেই হত্যাকারী সেনা কর্মকর্তারা পালটা আরেকটি অভ্যুত্থানের আশঙ্কায় ছিলেন। সেসময় সেনাবাহিনীর মধ্যে ছিল এক ধরনের বিশৃঙ্খলা। জ্যেষ্ঠ সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিল ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। বঙ্গবন্ধু হত্যাকারী সেনা কর্মকর্তারা ধারণা করেছিলেন যে, কোনো পালটা অভ্যুত্থান হলে সেটি আওয়ামী লীগের সমর্থন পাবে এবং জেলে থাকা চার জাতীয় নেতা নেতৃত্বে চলে আসবে। তারা আরও বুঝতে পেরেছিল যে এই চার নেতা জীবিত থাকলে তারা কোনোদিন রেহাই পাবে না। এরা বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার ও তাঁর আদর্শ বাস্তবায়নে অটুট থাকবেন। এরকম আশঙ্কা থেকে জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করা হয়েছে। জেল হত্যাকাণ্ডের সাথে ৩রা নভেম্বর মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে পালটা সামরিক অভ্যুত্থানের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কিত।

জেল হত্যা মামলার রায়

জেল হত্যা মামলার বিচারিক প্রক্রিয়ার তিনটি ধাপ পার হলেও দণ্ডিত ১১ আসামির ১০ জন এখনো পলাতক। জেল হত্যাকাণ্ডের পরদিন তৎকালীন ডিআইজি প্রিজন কাজী আবদুল আউয়াল লালবাগ থানায় মামলা করেন। দীর্ঘ ২১ বছর হত্যাকাণ্ডের তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়া বন্ধ রাখা হয়। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে জেল হত্যা মামলা পুনরুজ্জীবিত করে।

১৯৯৮ সালে ২০ জনকে আসামি করে সিআইডি আদালতে চার্জশিট দেয়। জেল হত্যার ২৯ বছর পর ২০০৪ সালের ২০শে অক্টোবর ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালত মামলার রায় ঘোষণা করে। মামলার রায়ে তিন জনকে মৃত্যুদণ্ড ও ১২ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। রায়ে চার জন রাজনীতিক ও একজন সরকারি কর্মকর্তাকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়।

বিচারিক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল হলে হাইকোর্ট ২০০৮ সালের ২৮শে আগস্ট এক রায়ে শুধু রিসালদার মোসলেম উদ্দিনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখে এবং মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত দফাদার মারফত আলী শাহ ও দফাদার আবুল হাসেম মৃধা এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত অপর চার আসামিকে খালাস দেয়। হাইকোর্টে খালাসপ্রাপ্ত এ চারজনের ফাঁসি কার্যকর হয় বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায়। আওয়ামী লীগ সরকার পুনরায় ক্ষমতায় আসার পর ২০০৯ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা হয়। ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত তিন আসামির মধ্যে শুধু দুজনকে খালাস দেওয়ায় রায়ের ওই অংশটির বিরুদ্ধে আপিল করে রাষ্ট্রপক্ষ। ২০১৩ সালে আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ জেল হত্যা মামলার চূড়ান্ত রায় দেয়। হাইকোর্টের রায়ে খালাস পাওয়া দফাদার মারফত আলী ও দফাদার আবুল হাসেম মৃধার মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখে আপিল বিভাগ। জেল হত্যা মামলার পলাতক আসামিদের দণ্ড কার্যকরের অপেক্ষায় রয়েছে গোটা জাতি।

জাতীয় চার নেতার মূল্যায়ন

জাতীয় চার নেতা বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিক ছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর খোন্দকার মোশতাক এই চার নেতাকে মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে অনুরোধ করেছিলেন। জাতীয় চার নেতার হাতে দুটি বিকল্প ছিল– একটি হচ্ছে মন্ত্রিসভায় যোগ দেওয়া, অপরটি হচ্ছে জেলে যাওয়া। জাতীয় চার নেতা খোন্দকার মোশতাকের মন্ত্রিসভায় যোগ না দিয়ে জেলে গিয়েছেন। কজন বাঙালি এরকম দূরদর্শী সিদ্ধান্ত নিতে পারে? জাতীয় চার নেতা নির্মোহ ছিলেন বিধায় এরকম কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছেন। তাঁরা জীবনের চেয়েও দেশকে বেশি ভালোবাসতেন। তাই তো তাঁরা মহান মুক্তিযুদ্ধে জীবন বাজি রেখে বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এই জাতীয় চার নেতা বাঙালি জাতির ইতিহাসে উজ্জ্বল নক্ষত্র।

বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়ানোর মতো নেতৃত্বকে সমূলে উৎখাত করার একটি নৃশংস পদক্ষেপ হচ্ছে ৩রা নভেম্বরের নারকীয় জেল হত্যাকাণ্ড। এই হত্যাকাণ্ড কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এটি ১৫ই আগস্টের অসমাপ্ত হত্যাকাণ্ডের বাস্তবায়ন। ১৯৭১ সালের বুদ্ধিজীবী হত্যা, ১৫ই আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবার হত্যা, ৩রা নভেম্বরের জেল হত্যা এবং ২১শে আগস্টের গ্রেনেড হামলা– একইসূত্রে গাঁথা। এরকম হত্যাকাণ্ড জাতি আর দেখতে চায় না। বাংলাদেশ যতদিন থাকবে– জাতি ততদিন বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতার অবদান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে।

মো. মামুন অর রশিদ: তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, লালমনিরহাট, diolalmonirhat57@gmail.com

সুবর্ণ জয়ন্তীর প্রত্যয়-প্রত্যাশা

অধ্যাপক গাজী আজিজুর রহমান

'মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ আসিতে তোমার দ্বারে/ মরুতীর হতে সুধাশ্যামলিম পারে।' বিশ্বকবির সেই অভিযাত্রার যেন সফল পরিসমাপ্তি ঘটেছিল ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ধনধান্য পুষ্পভরা সবুজ শ্যামল শস্যশীল স্বাধীন বাংলাদেশে। এই সুধাসাগর তীরে, রূপসি বাংলার পারে, সুখশান্তির নীড়ে পৌঁছতে বাঙালিকে পেরুতে হয়েছে হাজার বছরের অধিক কাল, লক্ষ কোটি মাইল বন্ধুর পথ, সাহারাসদৃশ মরু তিমির তমস রাত্রি, দুর্গমগিরি কান্তার মরু, সাতশ তরঙ্গায়িত নদী, গহীন বন-উপবন শ্বাপদ অরণ্য। ক্রুসেড পাড়ি দিতে যেমন দিতে হয়েছিল কত শত বলিদান, কত রক্ত-অশ্রু-মৃত্যু, অফুরান ধ্বংসলীলা; তেমনি স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখতে বাঙালিকে উৎসর্গ করতে হয়েছিল অগণন ক্ষয়ক্ষতি, আয়ু ও অগস্ত্যযাত্রা। সেই এক মহা-ইতিহাস। কত উত্থান, কত পতন, কত সংগ্রাম, কত বিপ্লব, কত বেদনা ও বিনিদ্র যামিনী পার হয়ে আমাদের পৌঁছাতে হয়েছিল অরুণিম উষালোকে– সেই উষার পূষা হলো আমাদের স্বাধীনতা।

বাঙালির যত চাওয়া-আশা-আকাঙ্ক্ষা-এষণা তার সব পথ এসে মিলিত জঙ্গমতা তৈরি করেছিল উত্তাল-উন্মাতাল ১৯৭১-এ। তখন শুধু একটি শব্দই বুলেটের মতো শব্দমান ছিল– স্বাধীনতা, বাংলার স্বাধীনতা। আর 'জয় বাংলা' ছিল তার মুক্তির স্লোগান, যুদ্ধের হাতিয়ার ও রণিত রণধ্বনি। আরেকটি নাম সেই সঙ্গে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতো ছাপান্ন হাজার বর্গমাইলের শিরা ও শোণিতে– শেখ মুজিব, শুধু নাম নয়, যেন ভিসুভিয়াসের অগ্নি-উগারী বান। তিনে মিলে উত্তপ্ত বাংলাদেশ, মুখরিত-কল্লোলিত-আন্দোলিত বাংলাদেশ, বিস্ফোরক বাংলাদেশ।

স্লোগান-মিটিং-মিছিল-ভাষণ থেকে অস্ত্রের ভাষায় উত্তরণ ঘটছে তখন স্বাধীনতা সংগ্রামের। তার আরও বিস্তৃতি ঘটেছে কবিতা-গান-নাটক-চিত্রকলা ও চলচ্চিত্রে। প্রতিদিন রক্তাক্ত হচ্ছে প্রান্তর-নদী, আঙিনা-আবাস। ভাই মারছে ভাইকে-বোনকে-পিতাকে-মাতাকে-বন্ধুকে। এ সেই তথাকথিত ভাই কুরু-পাণ্ডবের ভাইদের মতো ভাই। তাই আপন-পর সব একাকার। যুদ্ধ মানে না কোনো ভ্রাতৃত্ব-বন্ধুত্ব। যুদ্ধ এক বিবেকহীন অনৈতিকতার নাম, হৃদয়হীনতার নাম।

এখন থেকে পাঁচ হাজার বছরের অধিক আগে ভারতবর্ষের হস্তিনাপুরে, থানেশ্বর ও হিরন্বতী নদীর তীরে কুরুক্ষেত্র নামক প্রান্তরে সংঘটিত হয় এক হৃদয়বিদারক যুদ্ধ। যুদ্ধটা তো মূলত ভাইয়ে ভাইয়েই ছিল। কিন্তু কেউ কাউকে ছাড় দেয়নি। যুদ্ধটা যাতে না হয় সেজন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল ভীষ্ম। কিন্তু ভাইরা রাজি হয়নি। ধৃতরাষ্ট্রও সন্ধি চেয়েছিল কিন্তু পুত্ররা রাজি হয়নি। কৃষ্ণেরও চেষ্টা ছিল। আর অর্জুনতো যুদ্ধ করতেই চায়নি। কাকে মারবে, যেদিকে তাকায় সবাই তার জ্ঞাতি-গোত্র। কিন্তু কৃষ্ণ নৈতিকতার প্রশ্ন তুলে, অন্যায়ের সঙ্গে আপোশ না করে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করে অর্জুনকে। শুরু হয় ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ। তাতে প্রায় নির্বংশ হয় কুরু-পাণ্ডব। তারপর আঠারো দিনের মাথায় যুদ্ধের অবসান। জয় হয় পাণ্ডবদের অর্থাৎ সত্যের-ন্যায়ের-নৈতিকতার।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধও যেন ছিল এক দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। এখানেও তথাকথিত ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ। মূলত মুসলমান ও বাঙালি মুসলমানের যুদ্ধ। ভারতযুদ্ধ যেমন শুধু কুরু-পাণ্ডবের গৃহবিবাদ বা যুদ্ধ ছিল না, ছিল গোটা ভারত কাঁপানো রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক যুদ্ধ তেমনি পাকিস্তানিদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধটা ছিল রাজনৈতিক, কূটনৈতিকসহ অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যুদ্ধ। আমাদের যুদ্ধটাও শুধু পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, ছিল হিন্দুস্থানজুড়ে এবং এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে চীন-রাশিয়া-মধ্যপ্রাচ্য-আমেরিকা পর্যন্ত। বলা যায়, এটা ছিল একটা আংশিক বিশ্বযুদ্ধ। ব্রিটেন-ফ্রান্স-জার্মানির জনগণও এতে জড়িয়ে পড়ে। নিক্সন সরকার যদি মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে, তো এর জনগণ পক্ষে। বাঙালি ও কথিত পাকিস্তানি ভাইদের যুদ্ধটা তেমনি ছিল। তার ওপর পাকিস্তান শক্তির মাথা ছিল পরাশক্তি আমেরিকা ও চীন। ভারত ও রাশিয়া ছিল বাঙালির পক্ষে। তবু আমাদের ছিল কৃষ্ণরূপী ইন্দিরা গান্ধীর সমর্থন এবং অর্জুনরূপী বঙ্গবন্ধু ও সহস্র অর্জুন মুক্তিযোদ্ধার মাতৃভূমি রক্ষণ হেতু কে ডরে মরিতে দৃপ্ত শপথে। অর্জুন যেমন যুদ্ধ শুরুর শেষ সময় পর্যন্ত যুদ্ধ চায়নি, তেমনি বঙ্গবন্ধুও ২৫শে মার্চ পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলন, প্রতিরোধ আন্দোলন, গণতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের আন্দোলন করে এড়াতে চেয়েছিলেন যুদ্ধটা। যদিও ৭ই মার্চ তিনি স্বাধীনতা ও মুক্তির ডাক দেন সেটাও ভিন্নার্থে ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া। তারও আগে তাঁর ছয় দফার আন্দোলন, সেও তো ছিল স্বাধিকারের নামে স্বাধীনতা চাওয়া। তাঁর স্বাধীনতা ছিল রাজনৈতিক কৌশলের যুদ্ধ, সেই যুদ্ধেই পরাজিত হয় সেনাপতি আইয়ুব-ইয়াহিয়া।

আমাদের যুদ্ধটা ছিল বাঙালি হিন্দু-মুসলমান ও পাঞ্জাবি, সিন্ধি, বালুচ মুসলমানের মধ্যে। ওরা ছিল উর্দুভাষী, আমরা বাংলাভাষী। ওরা রুটি খোর, আমরা মাছে-ভাতে বাঙালি। ওদের সংস্কৃতি ইসলামি, আমাদের বাঙালি ও বাঙালিয়ানা। আমরা বাঙালি জাতীয়তাবাদী তো, ওরা মুসলিম জাতীয়তায় বিশ্বাসী। আমরা গণতন্ত্রী ও প্রগতিশীল, ওরা স্বৈরতন্ত্রী ও প্রতিক্রিয়াশীল।

তেল-জলের এই পার্থক্য নিয়ে ১৯৪৭-এ সৃষ্টি হলো পাকিস্তান। এ পাকিস্তান যে তাসের ঘর বুঝে গেল পূর্ব বাংলার মানুষ। শুধু মাটি দিয়ে কোনো দেশ হয় না, দেশ হয় মানুষ নিয়ে। সেই দেশে বসবাসরত মানুষ যখন পীড়নে-পেষণে অসহ্য হয়ে ওঠে, তার ভাষা-সংস্কৃতি-জাতিসত্তা হয়ে ওঠে হুমকিস্বরূপ, যদি তাদের অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে করে তোলা হয় সাম্প্রদায়িক, যদি তারা বৈষম্যের শিকার হয় প্রতি পদে পদে তাহলে সে দেশের ঐক্য টেকে না, টেকা উচিতও নয়। তাই পাকিস্তান টেকেনি পশ্চিম পাকিস্তানিদের বৈষম্যমূলক নীতি ও ঔপনিবেশিক মনোভাবের কারণে। কিন্তু ওরা টিকিয়ে রাখতে চেয়েছিল আমাদেরকে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে তাদের চাকরবাকর হিসেবে, খাঁচাবন্দি পশুপাখি হিসেবে। ওরা বোঝেনি বাঙালিরা মানুষ। আর নিপীড়িত মানুষতো স্বাধীনতা চাইবেই।

পাকিস্তানিরা ছিল বিভীষণ ভাই, দুর্যোধন ভাই। প্রমাণ পাওয়া যায় আইয়ুব, ইয়াহিয়া, ভুট্টো, টিক্কার আচরণে। দুর্যোধনদের এ অন্যায়-অবিচার, শাসন-শোষণ, পরাধীন করে রাখার বাঁধন ছিড়তেই আমাদের তেইশ বছরের সংগ্রাম। সেই সংগ্রামের সারথি ছিলেন বীর অর্জুনরূপে, লেনিনরূপে, মাও সে তুং, হো চি মিনরূপে আমাদের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাই আমাদের স্বাধীনতার কথা বলতে গেলে বার বার ধ্বনিত হয় শেখ মুজিবের পবিত্র নাম আর ১৯৭১, সহস্র বছরের শ্রেষ্ঠ বছরটির কথা।

একটি দেশ স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর বা সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করছে। এ এক মহা-আনন্দের বিষয়, গৌরবের বিষয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, জয়ন্তীটি আমাদের এমন সময় পালন করতে হচ্ছে যখন করোনা মহামারিতে বিশ্ব বিপর্যস্ত। সংস্কৃতির চাকা থেমে গেছে কিন্তু অর্থনীতির চাকা সচল আছে, অগ্রগতি অব্যাহত আছে। স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ পালন করছে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী। তার চেয়ে বড়ো কথা, দেশ চালাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি শেখ হাসিনার সরকার। তাই শত সংকট মোকাবিলা করে দেশ এগিয়ে চলছে, উন্নয়নের চাকা ঘুরছে তো ঘুরছে। এ এক বিস্ময়। এ ক্যারিশমা বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার। যখন চারপাশে আহাজারি, হাহাকার, শুকিয়ে যাচ্ছে সব শুভ চেতনা, তখন যেন কবি গেয়ে উঠলেন– 'জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো/ সকল মাধুরী লুকায়ে যায় গীতসুধারসে এসো'। কবির এই আকুতির রূপকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, বঙ্গবন্ধুর মতো যাঁর আদর্শ, উদ্যম। যিনি আজ সাত সাগরের মাঝি।

অমিত সম্ভাবনার এই দেশটি স্বাধীন হয়েছিল ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্তে, দুই লক্ষ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে, লক্ষ কোটি টাকার সম্পদহারা হয়ে, সমস্ত যোগাযোগের মাধ্যমগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে একটি পোড়ামাটির দেশে রূপান্তরিত হয়ে। সেই দুর্ভাগা দেশের হাল ধরেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তখন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসার জন্য মানুষের হাহাকারে দেশের আকাশ-বাতাস ভারী। বিশৃঙ্খলাও চরমে। কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ ঘটানোর অপচেষ্টা অব্যাহত। বিশাল হৃদয়ের বঙ্গবন্ধু ট্রোজান বীর হেকটরের মতো ছিলেন স্নেহ, মমতা, ভালোবাসার মূর্তিমান মানব। তাই তাঁর প্রিয় বাঙালির সব কষ্ট সহ্য করে, অসীম ধৈর্যে একে একে সব দুর্যোগ, বিপর্যয়, দুঃসময়কে মোকাবিলা করে গড়ে তোলেন এক নবীন আধুনিক রাষ্ট্র। দ্রুতই সব সচল হলো, ট্রেন চলল, প্লেন উড়ল, জাহাজ ভাসল, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় খুলল, ব্রিজ-কালভার্ট তৈরি হলো এবং সবুজ বিপ্লব ঘটল। সকল দেশের স্বীকৃতিও প্রায় সম্পন্ন হলো।

এই সফলতার সঙ্গে আরও যুক্ত হলো দেশের চমৎকার একটি সংবিধান। ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি, গঙ্গা চুক্তি, জাতীয় নির্বাচন, গড়ে তুললেন সকল দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক, পুনর্বাসিত হলো দেশত্যাগীরা, সম্মান পেল বীরাঙ্গনারা। বললেন, আমি শোষিতের দলে। পেলেন 'জুলিও কুরি' পুরস্কার। হলেন বিশ্বের এক নম্বর রাজনীতির কবি। তাক লাগার মতো একটা দেশ হলো, উন্নতির চাকা ঘুরতেই লাগল। বিশ্ব সভায় বাংলাদেশ এক বিস্ময় সৃষ্টি করল বঙ্গবন্ধুর ক্যারিশম্যাটিক নেতৃত্বে। তখনই ইন্দ্রপতন ঘটল। সপরিবার বঙ্গবন্ধু নিহত হলেন দেশের মীরজাফরদের হাতে। সেই থেকে একুশ বছর পাকিস্তান-আমেরিকার দোসর ও দালালরা দেশটাকে টেনে নিয়ে গেল পশ্চাতে। ধর্মকে করা হলো দেশের ভিত্তি। পাকিস্তানি জামা পরে দেশ চলল অদ্ভুত উটের পিঠে চড়ে। নতুন করে শুরু হয় শৃঙ্খলমুক্তির জন্য লড়াই, স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই। আর এই লড়াইয়ের সিপাহসালার হলেন জাতির পিতার অগ্নিকন্যা শেখ হাসিনা। ১৯৯৬ সালে দেশে আলো জ্বলল, ফুল ফুটল, রাত পোহালো। দেশ যাত্রা শুরু করল স্বপ্নের সোনার বাংলা অভিমুখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে। হঠাৎ যেন সব সবুজ ও সুন্দর হয়ে উঠল।

বাংলাদেশে সব শিশুরা স্কুলে যাচ্ছে। বছর শেষে বিনামূল্যে সব শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা বই পাচ্ছে। শিক্ষার হার বেড়েছে। মৃত্যুর হার কমেছে। গড় আয়ুও বেড়েছে। সর্বক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে। বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে ঈর্ষণীয়। বিশ্বকে টেক্কা দিয়ে নিজ অর্থায়নে পদ্মা সেতু হচ্ছে। মেট্রোরেল হচ্ছে। কর্ণফুলিতে টানেল হচ্ছে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ এগিয়ে চলেছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট হয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের যে-কোনো দেশের চেয়ে চৌদ্দটি সূচকে বাংলাদেশ এগিয়ে। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের উন্নয়নের মডেল। বাংলাদেশ এখন অন্য দেশকে ঋণ দেয়, শান্তি মিশনে সবচেয়ে অগ্রগণ্য দেশ, মানবতার দেশ, মধ্যম আয়ের দেশ। সব মিলে কোটি কোটি মানুষের কর্ম, কৃতিত্ব, সৃষ্টি, সৃজন, হৃদস্পন্দন ও জীবন-সংগ্রামে বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে এক উজ্জ্বল দুপুরের দিকে। সুবর্ণ জয়ন্তীর এই অর্জনই সুবর্ণ জয়ন্তীর সার্থকতা।

বঙ্গবন্ধু যদি বাংলাদেশের হৃদয়, শেখ হাসিনা তার প্রাণ। এখন আমরা যদি হই তার প্রতিধ্বনি তাহলে সোনার বাংলা গড়া কোনো স্বপ্ন নয়। কবির স্বপ্ন ছিল এ দেশ হবে স্বর্গের মতো, সকল দেশের সেরা, রূপে-রসে-রঙে অপরূপ, দেশ হবে আমাদের হৃদপিণ্ডের মতো সত্য, বাতিঘরের মতো আলোকিত, সুলতানের ছবির মতো সংগ্রামী, প্রমিথিউসের মতো বিপ্লবী এবং অবিনাশী চির উন্নত শির– এই প্রত্যাশা ও প্রত্যয়ে ঝলসে উঠুক সুবর্ণ জয়ন্তীর বাংলাদেশ। তবেই লেখা হবে সোনার আলপনায় বাংলাদেশের নাম। তবেই সুবর্ণ জয়ন্তীর সুসিদ্ধি। আমাদের প্রিয় কবি জসীমউদদীন ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের একটি ছবি এঁকেছিলেন 'বঙ্গবন্ধু' কবিতায়। তাঁর দুটি লাইন ছিল এ রকম–

> আরো একদিন ধন্য হইব, ধন-ধান্যেতে ভরা,
> জ্ঞানে-গরিমায় হাসিবে এদেশ সীমিত-বসুন্ধরা।

আমরা সুবর্ণ জয়ন্তীতে কবির সেই প্রত্যাশার প্রতিফলন দেখছি দিকে দিকে।

অধ্যাপক গাজী আজিজুর রহমান: সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ, কালীগঞ্জ কলেজের অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত), সাতক্ষীরা

বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণের সৌন্দর্য মীমাংসা

প্রফেসর নৃপেন্দ্রলাল দাশ

এক. নান্দনিক উচ্চারণ, 'দাবায়ে রাখতে পারবা না'

> 'অধর্ম? কে ধর্ম মানে? আমার ধর্ম শাস্ত্রশাসন।
> নিরস্ত্রকে মারব না তা সব সময় কি মানতে পারি?
> মারব না কি নির্ভূমিকে? নিরন্নকে? নিরস্ত্রকে?
> অবশ্য কেউ মেরে ছিল সেটাই বা কে প্রমাণ করে?
> (আত্মবিলাপ– শঙ্খ ঘোষ)

বক্তৃতা সম্পর্কে এক ধরনের অনীহা, অনাগ্রহ, অসহিষ্ণুতা চিরকাল কাজ করে শ্রোতার মনে। আর সে ভাষণ যদি হয় রাজনীতিকের, তাহলে অন্য রকম তা মনোযোগ স্বতঃই কল্লোলিত হয় জনমানসে। এমন এক অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন একজন অস্ট্রেলিয়ার ঔপন্যাসিক ডেভিড ম্যালুম। তিনি আন্তর্জাতিক পিইএন (PEN) আয়োজিত 'ইন্টারন্যাশনাল রাইটার্স ডে'তে এক 'টক' প্রদান করতে গিয়ে প্রথমেই বলে ফেললেন– The real enemy of writing is talk. তাঁর ভাষণটি পরে 'When the writer speaks' নামে বের হয়েছিল। এই লেখকের মন্দ ভাগ্য যে, তিনি সাতই মার্চের ভাষণটি শোনেননি। আমরা যারা প্রত্যক্ষভাবে ভাষণটি শুনেছিলাম, আমার আয়ুকে ধন্যবাদ জানাই আমরা তখন যুবা ছিলাম। রমনার দূর্বাদল জানে, আমরা আপ্লুত হয়েছিলাম। রেসকোর্সের ধূলিকণা জানে আমরা বুকের মাঝখানে একটি আগ্নেয়াস্ত্রকে খুঁজে পেয়েছিলাম। সাতই মার্চের ভাষণটিকে কবিতার মতো পঙ্‌ক্তি বিন্যাস করে, স্তবক নির্মাণ করে, অন্ত্যানুপ্রাসকে শোভাময় করে সাজালে একটি শুদ্ধতম কবিতা হয়ে যায়। এজন্যেই বলা হয় তিনি রাজনীতির কবি।

দুই. একটি ভাষণ বাঙালির মুক্তিসনদ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এসে দাঁড়ালেন মঞ্চে। ১৯৭১ সালের সাতই মার্চ ক্যালেন্ডারের পাতা থেকে এসে স্থান করে নিল আমাদের হৃদয়ে। তখন ধুম লেগেছে হৃদকমলে; আর তিনি গ্রিক ট্র্যাজেডির ধীরললিত নায়কের মতো বললেন, 'আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি'। বাঙালি জাতি ও বাংলার মানচিত্র যেন তাঁর মুখে আভা বিস্তার করেছে। এক ধরনের নাট্যিক টেনশন কাজ করেছে জনসমুদ্রে। বাঙালি জাতির হাজার বছরের কৃষ্টি যেন অগ্নিগর্ভ হয়েছে এ ভাষণে। গোপালগঞ্জের আঞ্চলিক বাক্‌ভঙ্গি ভাষণটিকে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। একদিকে প্রমিত বাংলার দীপ্র কথকতা, অন্যদিকে শতাব্দী বঞ্চিত দলিত মানুষের ভাষা আঞ্চলিকতার সীমা অতিক্রম করে পঞ্চগড় থেকে সন্দ্বীপ পর্যন্ত আতত হয়েছে। লোকতত্ত্ববিদরা ভাষার এই প্লাবনময় বিস্তারকে কী সংজ্ঞা দেন জানি না। লৌকিক বাক্‌ভঙ্গিতে জাতীয় নেতার সার্বভৌমিক পরিচয়, মেধা উপলব্ধি করা যায়। 'দাবায়ে', 'রাখবা' ইত্যাদি প্রবচনের মর্যাদা লাভ করেছে। শুধু দক্ষিণবঙ্গ নয়, সারা বাংলার বাক্‌প্রতিমা এসব উচ্চারণকলা। অলংকার শাস্ত্রে এক রকম অলংকারের কথা আছে, যাকে বলে 'অনন্বয়'। যার সঙ্গে অন্য কিছুর তুলনা চলে না। বোদলেয়ারের মতো বলা যায়– গোলাপ ঠিক গোলাপের মতো। সাতই মার্চের ভাষণ শুধু সাতই মার্চের ভাষণেরই মতো।

তিন. সৃজক মুজিব, তাঁর যশোগাথা

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনার শতবর্ষ পূর্তি হচ্ছে ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে। সেই চিরায়ত সৃজনকলাকে সামনে রেখে বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের কবিতাকে বিচার করা যায়।

এ ভাষণ শুধু বাঙালির স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রই নয়, বাংলা ভাষার রক্ত সম্পর্কে যে বাঙালি জাতীয়তাবাদ রচিত হয়েছে তার এক নান্দনিক নির্মাণ।

আফজালুল বাসার তাঁর 'বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণের সাহিত্যতত্ত্ব ও সংস্কৃতিতত্ত্ব' প্রবন্ধে বলেছেন, 'ভাষণ একেবারেই গণবোধ্য ভাষায় দেওয়া সত্ত্বেও তার মাধ্যমে পরা বাস্তবতা ছড়িয়ে পড়েছিল। ভাষণের পরে একাত্তরের পরবর্তী সময় ভাষণটির সারা অবয়বে যা কোন দিন এর শরীর থেকে খুলে ফেলে দেয়া যাবে না বা নিবিষে ফেলা যাবে না।' (*একবিংশ*, ডিসেম্বর ২০১৫, ঢাকা)

ইয়াসির আরাফাত, ফিদেল ক্যাস্ট্রো কিংবা আরও আগে গেলে লেনিন, মাও সে তুং, হো চি মিন প্রমুখের প্রজ্ঞা ও পরিপ্রশ্ন সাতই মার্চের ভাষণে প্রপন্ন প্রধান হয়েছে। অবাক লাগে, একটি ভাষণ সারা জাতির চৈতন্যে অংশগ্রহণ করল। স্বাধীনতা অর্জিত হলো। অথচ তিনি বিস্ফোরক, দাহ্য ও প্রাণত্যাগে প্রেরণাদায়ী। তাঁর অনুপস্থিতিতে ভাষণ সর্বক্ষণ পূর্ণ করেছে প্রেরণা, সূর্যাবর্তে।

চার. ভাষণের প্রকরণ ও প্রজ্ঞা

কবি খোন্দকার আশরাফ হোসেন এক প্রাকরণিক বিন্যাস করেছেন ভাষণটির। ভাষণটির দুটি ভাগ– এক. ইতিহাসবাহিত। দুই. দীপ্ত ঘোষণা। আলোচনাকে নস্যাৎ করে তিনি কতগুলো শর্তজুড়ে দেন–

১. সামরিক আইন মার্শাল ল উইথড্র করতে হবে।
২. যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে।
৩. জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

তারপর তিনি বজ্রকঠোর ঘোষণা দিলেন– 'আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই।' এই লক্ষ্যে তিনি কিছু নির্দেশনা প্রদান করেন। সেগুলো নিম্নরূপ :

১. তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো।
২. তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।
৩. জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু– আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি– তোমরা বন্ধ করে দেবে।
৪. যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছে দেবেন।
৫. যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে, খাজনা, ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো– কেউ দেবে না।
৬. এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি-ননবাঙালি যারা আছেন তারা আমাদের ভাই।
৭. যদি টেলিভিশনে আমাদের নিউজ না দেয়, কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবে না।
৮. দুই ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে।
৯. প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক মহল্লায়, প্রত্যেক ইউনিয়নে, প্রত্যেক সাবডিভিশনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো।
১০. মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো, ইনশাল্লাহ।

পাঁচ. শেষ কথা

লোকতত্ত্ববিদ, বাংলা একাডেমির প্রাক্তন মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান সাতই মার্চের ভাষণের তাত্ত্বিক ও লোকযানিক ব্যাখ্যা করে বলেছেন, 'বাংলাদেশের মানুষের একটি স্বকীয় সত্তা ও নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে। লৌকিক ভাষাগুলোর বাক্‌প্রতিমায় তার চমৎকার ও লাগসই প্রকাশ ঘটে। এই বিশিষ্ট সত্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য চারিত্রিক উদার্য বিদ্রোহের মানসিকতা এবং কোনো অবস্থাতেই মাথা নত না করা। বাংলার পৌরাণিক চরিত্র চাঁদ সওদাগর, সাহিত্যের চরিত্র হানিফ গাজী ও তোরাব, কাব্য স্রষ্টা কবি নজরুল এবং মানবিক ও রাজনৈতিক চরিত্র শেখ মুজিবের আমরা এই বিদ্রোহী সত্তার পরিচয় পাই। বাঙালি চরিত্রের এই বিশিষ্ট রূপের স্পর্শে ৭ই মার্চের ভাষণে যুক্ত হয়েছে অনন্য বৈভব।' (আশরাফের প্রবন্ধে উদ্ধৃত)

এক মননজীবী লিখেছিলেন, বিশ্ববিদ্যায়তনিক বিদ্যাব্রতীরা 'ঠিকে ঝির মতো' দশ বাড়িতে বাসন মাজা, কাপড় কাচা, ঝাড়ু দেওয়া তাদের কাজ। আমরাও দেখি এনজিও পোষিত গৃহপালিত মননজীবীরা কখনো 'গবেষণা ধর্মী' নন। গবেষণা মানে সত্যকে আবিষ্কার, সুন্দরকে উপস্থাপন করা। তাঁরা যদি সত্যিকারভাবে 'গবেষণা' করেন তবে সাতই মার্চের বহুমাত্রিক মেধা ও মধুছন্দার আলো-হাওয়া-রৌদ্র আমাদেরকে ঋণী করবে।

নানা সীমাবদ্ধতা আর প্রয়োজনীয় উপাত্ত চিরকালই আমাদের কাছে অলভ্য।

প্রফেসর নৃপেন্দ্রলাল দাশ: কবি, গবেষক, বহুগ্রন্থ প্রণেতা, অবসরপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান ও অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সরকারি কেশব চন্দ্র (কে. সি.) কলেজ, ঝিনাইদহ

অসমাপ্ত আত্মজীবনী'র মারাঠী সংস্করণের মোড়ক উন্মোচন

ভারতের মুম্বাই-এ বাংলাদেশ উপহাইকমিশনের উদ্যোগে ১৩ই অক্টোবর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*-এর মারাঠী সংস্করণ *অপূর্ণ আত্মকথা*-এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানে মহারাষ্ট্রের গভর্নর ভগৎ সিং কুশিয়ারী প্রধান অতিথি এবং মুম্বাই মারাঠী সাংবাদিক সমিতির সভাপতি নরেন্দ্র ওয়াবেল, অনারারি কন্সাল জেনারেল গ্রুপের সভাপতি ভিজয় কালান্ত্রি এবং দিল্লির বাংলাদেশ হাইকমিশনের উপহাইকমিশনার মো. নুরুল ইসলাম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের একটি ভিডিও বার্তা প্রদর্শন করা হয়। এ বার্তায় তিনি জাতির পিতার আদর্শ আজও আমাদের পররাষ্ট্রনীতির প্রতিপাদ্য বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, মারাঠী সংস্করণ *অপূর্ণ আত্মকথা*-এর মোড়ক উন্মোচনের মাধ্যমে মুম্বাই উপহাইকমিশন নতুন মাত্রা যোগ করেছে। যে দুই ডজন ভাষায় ঐতিহাসিক এ বইটি অনূদিত হয়েছে, তার সাথে এ অঞ্চলের মারাঠী ভাষা যুক্ত হলো।

মুম্বাই-এ নিযুক্ত বাংলাদেশের উপহাইকমিশনার মো. লুৎফর রহমান *অপূর্ণ আত্মকথা* বইটি জাতির পিতার রাজনীতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভে এবং তাঁর আদর্শ উপলব্ধি করতে মারাঠী ভাষাভাষীদের সহায়তা করবে বলে উল্লেখ করেন। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতীয় ওয়ার ভেটেরানদের অবদানের কথা স্মরণ করেন।

মহারাষ্ট্রের গভর্নর ভগৎ সিং কুশিয়ারী বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী নেতৃত্ব, ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি ও আদর্শ শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ অনুধাবনে বইটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। পরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনীর সাবেক সদস্যদের (ওয়ার ভেটেরান) ক্রেস্ট প্রদান এবং মহারাষ্ট্রের ঐতিহ্যবাহী শাল প্রদানের মাধ্যমে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

প্রতিবেদন: মুরাদ হোসেন

বঙ্গবন্ধু ও সংবিধানের পূর্বাপর

খান চমন-ই-এলাহি

যে সকল বিষয় সমাজ ও রাষ্ট্রকে পরিচালিত করে সংবিধান তার মধ্যে অন্যতম। পবিত্র সংবিধান রাষ্ট্র-কল্যাণের বাতিঘর। রাষ্ট্রের প্রতিচ্ছবি। আয়নায় ছবি দেখার মতো সংবিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে ভালোভাবে জানা যায়। একটি রাষ্ট্রকে চিনতে হলে প্রথমেই তার সংবিধান ও সাংবিধানিক অবস্থান পরিষ্কারভাবে জানতে হয়। বুঝতে হয় তার আকার-প্রকৃতি ও জনস্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা।

রাষ্ট্র পরিচালনায় বহু রকম আইন ও প্রথা কাজ করে। নাগরিক স্বার্থে আইন ও প্রথার ব্যবহার বিদ্যমান। এ সকল আইন ও প্রথার প্রাণভোমরা পবিত্র সংবিধান। কোনো দেশের সংবিধানকে কেন্দ্র করে সে দেশের আইন, বিধি-বিধান প্রণয়ন করা হয়। সংবিধানের আলোকে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হয়। রাষ্ট্রের সার্বিক কল্যাণে এবং বিশ্বে রাষ্ট্র হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকার প্রয়োজনে সংবিধান আবশ্যক। সংবিধান অনস্বীকার্য, হোক তা লিখিত কিংবা অলিখিত। পৃথিবীতে কোনো কোনো দেশ পরিচালিত হয় লিখিত সংবিধানে। আবার কোনো কোনো দেশ পরিচালিত হয় অলিখিত সংবিধানে। লিখিত ও অলিখিত যা-ই হোক সংবিধান ছাড়া রাষ্ট্র নেই। জনগণ, নির্দিষ্ট সীমা, সরকার ও সার্বভৌমত্ব থাকলে রাষ্ট্র পাই বটে, প্রকৃতপক্ষে দৃশ্যমান বা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কোনো রাষ্ট্রীয় রূপ ফুটে ওঠে উক্ত রাষ্ট্র যখন সংবিধান দ্বারা পরিচালিত হয়। একটি রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভের পর কিংবা গঠিত হওয়ার পর সংবিধানের দিকে নজর দেওয়া আবশ্যক। কখনো কখনো এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান ও ভারত জন্ম লাভ করে। ভারত রাষ্ট্র হিসেবে আগেই তার সংবিধান প্রণয়ন করতে পারলেও পাকিস্তান ১৯৫৬ সালে প্রথম সংবিধান রচনা করে। পিছিয়ে পড়ে পাকিস্তান। রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান ব্যর্থ হয়। পূর্ব পাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশ পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের উদ্যোগে অসন্তোষ প্রকাশ করে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৬'র মধ্যেই সংঘটিত হয় ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলন। একসময়ে স্বাধিকার থেকে স্বায়ত্তশাসন, স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতার আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। ব্রিটিশ ভারতের জঠর থেকে পাকিস্তান ও ভারতের স্বাধীনতা ও পবিত্র সংবিধান প্রাপ্তি এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও পবিত্র সংবিধান প্রাপ্তির মধ্যে মোটা দাগের ব্যবধান রয়েছে। যা হোক, পিতৃ রাষ্ট্র বা পূর্ব রাষ্ট্রের তুলনায় বাংলাদেশ পৃথিবীর ইতিহাসের স্বল্পতম সময়ে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য পবিত্র সংবিধান লাভ করে।

বাংলাদেশ প্রথম বিজয় দিবসের বার্ষিকী অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর সংবিধান লাভ করে। সংবিধান নিয়ে অনেক কথা বলা যায়। কিন্তু সর্বাগ্রে আমাদের প্রয়োজন লাল-সবুজের পতাকা সমন্বিত, 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানে উচ্চারিত বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধান নিয়ে মাঝে মধ্যেই একে অন্যের সাথে কথা বলা, আলাপ-আলোচনা করা। যাতে আমরা সামাজিকভাবে, সুশৃঙ্খল উপায়ে, আন্তর্জাতিক মঞ্চে পরিচালিত হই, হতে পারি। দেশের প্রতিটি নাগরিক মাত্র বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধান ভালোভাবে জানলে অন্য নাগরিকদের কোনো রকম ক্ষতি করতে পারে না। একে অন্যের, পরস্পর একসাথে বসবাস করতে পারে। পরমত সহিষ্ণু জীবনযাপন করতে পারে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর সর্বপ্রথম সবচেয়ে গুরুত্বের সাথে গণপরিষদে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান বিল' বা 'সংবিধান বিল' উপস্থাপিত, গৃহীত ও কার্যকর হয়। ১৯৭২ সালের ২৩শে মার্চ সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়, যা উপস্থাপিত হয় ১২ই অক্টোবর ১৯৭২। আর এ সংবিধান গৃহীত হয় ৪ঠা নভেম্বর ১৯৭২। ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭২ সাল থেকে বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধান বলবৎ হয়। স্মর্তব্য, গণপরিষদ গঠিত হয় ১৯৭২ সালের ২৩শে মার্চ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক 'Constituent Assembly of Bangladesh Order 1972' জারির মাধ্যমে। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরের ৭ ও ১৭ তারিখে পূর্ব পাকিস্তানে (অর্থাৎ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ) নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের নিয়ে এ গণপরিষদ বা বাংলাদেশ গণপরিষদ গঠিত হয়।

গণপরিষদের (বহিষ্কৃত ও পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্যকারীদের বাদে ৪০৪ জন সদস্যের মধ্যে) ৩৪ জন সদস্যের সমন্বয়ে সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়। আইন ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী ড. কামাল হোসেনকে সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। এ কমিটিতে একমাত্র মহিলা সদস্য ছিলেন বেগম রাজিয়া বানু। অন্যান্য সদস্যরা হলেন– তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এএইচএম কামারুজ্জামান, এম আমীরুল ইসলাম, ডা. ক্ষিতিশ চন্দ্র, আব্দুল মমিন তালুকদার, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ প্রমুখ। আমাদের মূল সংবিধানের বাংলা ভাষ্য রূপ পর্যালোচনার জন্য ড. আনিসুজ্জামানকে আহ্বায়ক, সৈয়দ আলী আহসান এবং মযহারুল ইসলামকে নিয়ে ভাষা বিশেষজ্ঞ হিসেবে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি ভাষার নানা দিক পরীক্ষানিরীক্ষা করেন। শুধু তাই নয়, একটি আদর্শ সংবিধান প্রণয়ন, প্রকাশ ও প্রচারের

জন্য বঙ্গবন্ধুর সরকার সর্ব প্রকার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। শিল্পমান ঠিক রাখার জন্য শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনকে প্রধান করে সংবিধান অলংকরণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির অন্য সদস্যগণ হলেন– শিল্পী হাশেম খান, জনাবুল ইসলাম, সমরজিৎ রায় চৌধুরী ও আবুল বারক আলভী। এ সংবিধান হাতে লেখার দায়িত্ব পালনের জন্য দেশে ফিরতে হয় লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশনের দ্বিতীয় সচিব পেশাদার লিপিকার এ কে এম আবদুর রউফকে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বপ্রথম সংবিধানের বাংলা ও ইংরেজি পাঠে স্বাক্ষর দান করেন। বাঙালি জাতির পিতার স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে বাঙালি ও বাংলাদেশ ইতিহাসের সোনালি যুগে প্রবেশ করে।

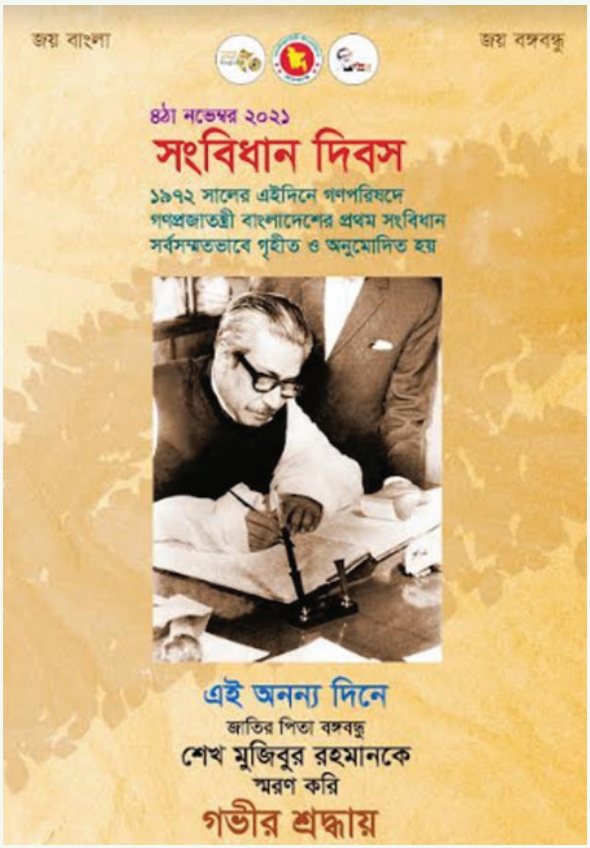

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ধর্মান্ধ পাকিস্তানের গহ্বর থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করেছিলেন। তিনি ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) ঘোষণা করেন– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।' জয় বাংলার দেশ– বাংলাদেশ স্বাধীনতা ও বিজয় অর্জন করে। জয় বাংলা পবিত্র সংবিধানও লাভ করে। এগিয়ে যাওয়ার মন্ত্রে ও দীক্ষায় এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত বাঙালি তাঁর শেখানো পথে সংবিধানে চারটি মূলনীতি গ্রহণ করে। যথা: (১) ধর্মনিরপেক্ষতা, (২) জাতীয়তাবাদ, (৩) গণতন্ত্র ও (৪) সমাজতন্ত্র। ১৯৭২ সালের এ মূলনীতি চারটি বাংলাদেশের মানুষ মনেপ্রাণে গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ পেরিয়েও সংবিধান প্রশ্নে আজও মনে পড়ে বঙ্গবন্ধুর সেই বিখ্যাত উক্তি। বাঙালি জাতির পিতা বলেন, দুনিয়ার ইতিহাসে দেখা যায় না, দশ মাসের মধ্যে কোনো দেশ শাসনতন্ত্র দিতে পেরেছে। আমি নিশ্চয় মোবারকবাদ জানাবো শাসনতন্ত্র কমিটির সদস্যদের। মোবারকবাদ জানাবো বাংলার জনসাধারণকে। রক্তে লেখা এই শাসনতন্ত্র। যারা আজ অন্য কথা বলেন বা চিন্তা করেন, তাদের বোঝা উচিত যে এ শাসনতন্ত্র আলোচনা আজ থেকে শুরু হয় নাই। অনেকে যারা বক্তৃতা করেন, তাদের জন্মের আগের থেকে তা শুরু হয়েছে এবং এ জন্য অনেক আন্দোলন করতে হয়েছে। অনেক রক্ত দিতে হয়েছে। এই শাসনতন্ত্রের আলোচনা হতে হতে শাসনতন্ত্র কী হবে, তার ওপরে ভোটের মাধ্যমে, শতকরা ৯৮ জন তাদের ভোট আওয়ামী লীগকে দিয়েছেন। শাসনতন্ত্র দেওয়ার অধিকার আওয়ামী লীগের রয়েছে।... শাসনতন্ত্র ছাড়া কোনো দেশ– তার অর্থ হলো মাঝিবিহীন নৌকা, হালবিহীন নৌকা। শাসনতন্ত্রে মানুষের অধিকার থাকবে। শাসনতন্ত্রে মানুষের অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্যও থাকবে। এখানে Free style democracy চলতে পারে না। শাসনতন্ত্রে জনগণের অধিকার থাকবে, কর্তব্যও থাকবে এবং যতদূর সম্ভব– যে শাসনতন্ত্র পেশ করা হয়েছে সেটি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক হয়ে থাকবে, সে সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের আদর্শ পরিষ্কার হয়ে রয়েছে। এই পরিষ্কার আদর্শের ভিত্তিতে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে এবং সে আদর্শের ভিত্তিতে এ দেশ চলবে। জাতীয়তাবাদ–বাঙালি জাতীয়তাবাদ। এই বাঙালি জাতীয়তাবাদে চলবে বাংলাদেশ। বাংলার কৃষ্টি, বাংলার ঐতিহ্য, বাংলার আকাশ-বাতাস, বাঙালির রক্ত দিয়ে বাংলার জাতীয়তাবাদ। আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। জনসাধারণের ভোটের অধিকারে বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি সমাজতন্ত্র– যেখানে শোষণহীন সমাজ থাকবে। শোষকশ্রেণি আর কোনোদিন দেশের মানুষকে শোষণ করতে পারবে না। ... আর হবে ধর্মনিরপেক্ষতা। এই চারটি আদর্শের ভিত্তিতে বাংলার শাসনতন্ত্র তৈরি হবে। এটা জনগণ চায়। জনগণ এটা বিশ্বাস করে। জনগণ এই জন্য সংগ্রাম করেছে। লক্ষ লক্ষ লোক এই জন্য জীবন দিয়েছে। এই আদর্শ নিয়েই বাংলার নতুন সমাজ গড়ে উঠবে।

বাঙালির দাবির প্রতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমর্থন ছিল। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান জাতির পিতা সর্বত্র সব সময়ে জাতির সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, অতীত-ভবিষ্যৎ নিয়ে ভেবেছেন। পবিত্র সংবিধানে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও চিন্তার প্রতিফলন ঘটতে দেখা যায়। পবিত্র সংবিধানের চারটি মূলনীতি ও এর আলোকে প্রণীত সংবিধান শহিদের রক্তে লেখা, দীর্ঘ সংগ্রামের সোনালি কলমে লেখা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে দুটি পাঠ রয়েছে। একটি পাঠ বাংলায় ও অন্য পাঠ ইংরেজিতে। বিরোধ দেখা দিলে বাংলা পাঠ অগ্রাধিকার ও প্রাধান্য পাবে। বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানে ১১টি ভাগ রয়েছে। ১৫৩টি অনুচ্ছেদ ছাড়াও যুক্ত হয়েছে ৭টি তফশিল। নানা সময়ে ভালোমন্দ মিলিয়ে ১৭টি সংশোধনী এসেছে। সর্বোচ্চ আদালত মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট অভিভাবক হিসেবে ৫ম, ৭মসহ কয়েকটি সংশোধনী বাতিল করেছে। এ সংবিধানের অন্যতম দিক হলো প্রস্তাবনা, যা আমাদের জাতীয় চেতনাকে শাণিত করে। আমাদের দীর্ঘকালের সংগ্রামকে উদ্দীপ্ত, অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত করে। প্রস্তাবনার শুরুটার দিকে তাকালেই আমরা দেখতে পাই আমাদের জাতি রাষ্ট্রের বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় উপাদান। শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে, আমরা বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতার ঘোষণা করিয়া জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। আমরা অঙ্গীকার করতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহিদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শই সংবিধানের মূলনীতি হইবে। একপর্যায়ে প্রস্তাবনার শেষ পর্যায়ে এসে আমরা পাঠ করি, এতদ্বারা আমাদের এই গণপরিষদে অদ্য তেরোশত উনআশি বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসের আঠারো তারিখ মোতাবেক উনিশ শত বাহাত্তর খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের চার তারিখে, আমরা এই সংবিধান রচনা ও বিধিবদ্ধ করিয়া সমবেতভাবে গ্রহণ করিলাম।

সংবিধানের প্রথমভাগের সপ্তম অনুচ্ছেদে সংবিধানের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে। অনুচ্ছেদ ৭ (১)-এ বলা হয়েছে, প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে। আর ৭(২)- এ বলা হয়েছে, জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তি রূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোনো আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্য হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।

বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধান নিজেই তার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছে। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়েছে। সংবিধানের দশম ভাগে সংবিধানের বিধান সংশোধনের ক্ষমতা প্রসঙ্গে অনুচ্ছেদ ১৪২-এ বলা হয়েছে, এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে– তাহা সত্ত্বেও (ক) সংসদের আইন দ্বারা এই সংবিধানের কোন বিধান সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণের দ্বারা সংশোধিত হইতে পারিবে: তবে শর্ত থাকে যে, (অ) অনুরূপ সংশোধনীর জন্য আনীত কোন বিলের সম্পূর্ণ শিরোনামে এই সংবিধানের কোন বিধান সংশোধন করা হইবে বলিয়া স্পষ্টরূপে উল্লেখ না থাকিলে বিলটি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা যাইবে না। (আ) সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত না হইলে অনুরূপ কোন বিলে সম্মতিদানের জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইবে না, (খ) উপরিউক্ত উপায়ে কোন বিল গৃহীত হইবার পর সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট তাহা উপস্থাপিত হইলে উপস্থাপনের সাত দিনের মধ্যে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিবেন, এবং তিনি তাহা করিতে অসামর্থ্য হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

আমরা যারা পাঠক ও সুনাগরিক তারা উপলব্ধি করতে পারছি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জনগণের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা ও দরদ ছিল। সংবিধান নিয়ে তাঁর ভাবনা আমাদের আন্দোলিত, উজ্জীবিত করে। এই শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনা কিংবা বিভিন্ন অনুচ্ছেদের অভিব্যক্তি ও গভীর প্রকাশ ভবিষ্যতে চলার সর্ব প্রকার নির্দেশনা। নভেম্বর মাস এলে বিশেষ করে চার নভেম্বর এলে আমরা স্মৃতিকাতর হয়ে বঙ্গবন্ধুর সংবিধান সংক্রান্ত নানা বক্তব্য খুঁজে ফিরি। নিজেদের নির্মাণ করার চেষ্টা করি। সংবিধানের মূল চরিত্র রক্ষায় সরকার বদ্ধপরিকর। বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার সংবিধানের পবিত্রতা রক্ষায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। শাণিত হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষের শক্তি। বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের এ পর্যায়ে সংবিধান সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য দিয়ে এ প্রবন্ধ পাঠের সমাপ্তি টানতে পারি। পাঠক হিসেবে আমরা মনে করতে পারি বঙ্গবন্ধুর দেশ ও জাতির কল্যাণে প্রদত্ত সেই উক্তি। তিনি বলেন,

> এই সংবিধান শহিদের রক্তে লিখিত। এ সংবিধান সমগ্র জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক হয়ে বেঁচে থাকবে।

নিশ্চয়ই বঙ্গবন্ধুর স্বাক্ষরিত সংবিধান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আলোর পথ দেখিয়েছে, দেখায় ও দেখাবে।

খান চমন-ই-এলাহি: কবি, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক ও আইনজীবী

কলকাতা প্রেসক্লাবে বঙ্গবন্ধু সংবাদ কেন্দ্র উদ্‌বোধন

কলকাতা প্রেসক্লাবে বঙ্গবন্ধু সংবাদ কেন্দ্র উদ্‌বোধন করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ। ভারত সফররত তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ২৮শে অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় ঐতিহ্যবাহী প্রেসক্লাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে প্রতিষ্ঠিত এই সংবাদ কেন্দ্র উদ্‌বোধনকালে প্রেসক্লাবের প্রেসিডেন্ট স্নেহাশিস সুর, সাধারণ সম্পাদক কিংশুক প্রামাণিক, বাংলাদেশের সংসদ সদস্য সাইমুম সরওয়ার কমল, কলকাতায় বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনার তৌফিক হাসান, উপ-দূতাবাসের প্রথম সচিব (প্রেস) রঞ্জন সেন এবং প্রেসক্লাবের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী তার বক্তৃতায় বলেন, বাংলাদেশ যে সময়ে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও বাংলাদেশ-ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্কের পঞ্চাশ বছরপূর্তি উদ্‌যাপন করছে, সে সময়ে বঙ্গবন্ধুর নামে কলকাতা প্রেসক্লাবে সংবাদ কেন্দ্র স্থাপন দুদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের আরেকটি মাইলফলক।

ড. হাছান মাহ্‌মুদ এসময় ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের জনগণ ও সরকারের অকুণ্ঠ সহায়তা এবং ভারতীয় হাজার হাজার সেনাসদস্যের প্রাণদানের কথা উল্লেখ করেন। সেই সাথে তিনি বলেন, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের খবর সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে কলকাতা প্রেসক্লাব যে বিশাল ভূমিকা রেখেছে, তা ভুলবার নয়।

কলকাতায় বাংলাদেশ উপ-দূতাবাসের সহায়তায় স্থাপিত এই সংবাদ কেন্দ্রে কম্পিউটার, প্রদর্শনী হল, লাইব্রেরি এবং প্রজেক্টরসহ আধুনিক ডিজিটাল সুবিধাদি রয়েছে। এর আগে সেপ্টেম্বরে নয়াদিল্লিতে প্রেসক্লাব অব ইন্ডিয়ায় বঙ্গবন্ধু মিডিয়া সেন্টার উদ্‌বোধন করেন মন্ত্রী।

কলকাতা প্রেসক্লাবের প্রেসিডেন্ট স্নেহাশিস সুর বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে এ সংবাদ কেন্দ্র স্থাপন আমাদের জন্য গর্বের বিষয়। বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘদিন আন্দোলন ও সংগ্রাম করায় ভারতে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। এ সংবাদ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার অর্থ বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো। বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে প্রকৃত ইতিহাস জানতে নতুন প্রজন্মের জন্য এই কেন্দ্র উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

প্রতিবেদন : সুরাইয়া শিমুল

পঞ্চাশ বছরে বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ

সাহিদা বেগম

বাংলাদেশের সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে সোনার বাংলা হিসেবে গড়তে চেয়েছিলেন। এই গড়তে চাওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে তিনি 'ছয় দফা' দিয়েছিলেন শাসকের সামনে। সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি থেকে দেশ স্বাধীন হয়েছে ১৯৭১ সালে। এই অর্ধশতবর্ষে দেশের অর্জন অনেক। বাঙালি আজ গর্বিত বাংলাদেশকে নিয়ে। যদিও পূর্ণতার জন্যে আমাদের আরও অনেক পথ অতিক্রম করতে হবে।

অর্জনটা কাঙ্ক্ষিতই ছিল। এই কাঙ্ক্ষিত অর্জনের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যেই যুদ্ধ করে দেশটাকে স্বাধীন করেছিলাম। যুদ্ধবিধ্বস্ত একটা নতুন দেশের জন্ম, বেড়ে ওঠা, টিকে থাকা এবং সমৃদ্ধি অর্জন কম কথা নয়। বাংলাদেশের এই অর্জনটা অনেক বড়ো। বাংলাদেশের সুবর্ণ জয়ন্তী এবং জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী– দুটোই আমাদের জন্য বড়ো উপহার। এর চেয়ে বড়ো উপহার আর হতে পারে না।

জাতিসংঘের প্রয়োজনীয় দুই দফা সুপারিশ পাওয়া গেছে। আসছে ২০২৬ সাল থেকে বুক ফুলিয়ে বিশ্বকে বলতে পারব আমরা, বাংলাদেশ আর দরিদ্র বা স্বল্পোন্নত দেশ নয়, বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশ এবং আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে উন্নত দেশের পথে। এ পথেই আমরা একদিন পৌঁছে যাব আমাদের লক্ষ্যে। মানুষ আজ জনসম্পদে রূপান্তর হয়েছে। বাংলাদেশের এই উন্নয়ন হঠাৎ হয়নি। সরকারের প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা, চেষ্টা ও নীতি সহায়তায় এসেছে এই সফলতা। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং সরকারের দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় দেশের জনগণের সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম, মেধা, নানা উদ্ভাবনী শক্তি ব্যবহার করে এই অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটেছে। সকল ক্ষেত্রে একটু একটু অর্জন করে আর সাফল্য লাভ করে আজ আমাদের বাংলাদেশ।

এদেশের মানুষ স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য শ্রম-মেধা নিজেদের অফুরন্ত সম্ভাবনা উজার করে দেয়। কঠিন পরিশ্রম করে, তিল তিল করে ভবিষ্যতের সিঁড়ি বিনির্মাণ করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে আমরা আমাদের অর্জনের গল্প করি। পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের অর্জন বা প্রাপ্তি হলো– খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা, গার্মেন্ট বিপ্লব, নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা-স্বাস্থ্য সকল ক্ষেত্রে নারী উন্নয়ন অগ্রযাত্রা, কমিউনিটি ক্লিনিক, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, স্যানিটেশন, পদ্মা সেতু, যমুনা সেতু, উত্তরবঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগের অভূতপূর্ব উন্নয়ন, যুদ্ধাপরাধের বিচার, ডিজিটাল বাংলাদেশ ইত্যাদি। ঢাকা মেগাসিটি। মেট্রোরেল পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয়েছে। রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে নির্মিত ফ্লাইওভারগুলোর সুফল পাওয়া যাচ্ছে। সুনামগঞ্জসহ বিভিন্ন হাওর এলাকার যোগাযোগের একমাত্র উপায় ছিল– বানে নাও, উন্নায় পাও। সেসব হাওর এলাকায় আজ বড়ো বড়ো সুপ্রশস্ত পাকা রাস্তা। যোগাযোগ ব্যবস্থার দারুণ উন্নয়ন ঘটেছে।

বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু ৭৩ বছরের বেশি। বর্তমানে মাতৃমৃত্যু এবং শিশুমৃত্যুর হার অনেক কমেছে। শিক্ষার হার বেড়েছে, দেশে বর্তমানে ৯৮ শতাংশ শিশু বিদ্যালয়ে যায়। বাণিজ্য উদারিকরণ এবং মুক্তবাণিজ্যের দেশ হওয়াতে বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের উচ্চহার। বাংলাদেশে বিশ্বমানের পণ্য তৈরি হয় এবং শতভাগ রপ্তানি হয়। আমেরিকার চোখ ধাঁধানো আলো ঝলমলে বিশাল শপিং মল থেকে পোশাক কিনে এনে বাসায় খুলে যখন দেখা যায় 'মেইড ইন বাংলাদেশ', তখন গর্ব হয় বাংলাদেশি হিসেবে।

জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান শুধু বঙ্গবন্ধু ছিলেন না, তিনি ছিলেন বিশ্ববন্ধু। তিনি কোমল মনের মানুষ। তিনি বাঙালিকে ভালোবাসতেন। বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বাস্তবায়নের স্বপ্ন ছিল। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বের ঝানু রাজনীতিবিদদের একজন হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। বাংলাদেশ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। বাংলাদেশকে আরও অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তার জন্য শেখ হাসিনার মতো যোগ্য নেতৃত্বের কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশকে নিয়ে যখন বিদেশিরা উচ্চ প্রশংসা করে তখন গর্বে বুক ভরে যায়।

বাংলাদেশ পঞ্চাশ বছরে অবিশ্বাস্য উন্নতির সাফল্যের শিখরে পৌঁছেছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধারাবাহিকভাবে অর্জিত হচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের তথ্য মতে, চলমান মহামারির বছরের আগে বাংলাদেশের অর্থনীতি ৭ থেকে ৮ শতাংশ বেড়েছে, যা চীনের চেয়েও এগিয়ে। এখন বাঙালি জাতিকে সম্মিলিতভাবে দেশের এই অর্জনকে ধরে রাখতে হবে, আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

সাহিদা বেগম: আইনজীবী, গবেষক ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৩শে জানুয়ারি ২০২১ ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুজিববর্ষ উপলক্ষে সারা দেশে ৭০ হাজার ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ঘর ও জমির দলিল হস্তান্তর করেন– পিআইডি

বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্ব ও দূরদর্শিতা

ড. মোহাম্মদ হাসান খান

বঙ্গবন্ধু দূরদর্শী নেতা ছিলেন বলেই পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর বুঝতে পেরেছেন এই রাষ্ট্র বাঙালির জন্য নয়। তিনি বাংলাকে স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখতেন এবং তাঁর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয় ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর। বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতার কারণেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। জাতির পিতার আরেকটি স্বপ্ন ছিল 'সোনার বাংলা'। সোনার বাংলা গঠনের কাজ তিনি শুরু করেছিলেন, কিন্তু শেষ করতে পারেননি। ঘাতকরা তাঁকে বাঁচতে দেয়নি। উন্নত সমৃদ্ধ অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়তে হলে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হবে– শেখ হাসিনা তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই শুরু থেকে তিনি বঙ্গবন্ধুর আদর্শ নিয়ে দেশ গড়ার কাজে হাত দেন। বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। এই অগ্রগতির মূলে রয়েছে জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী চিন্তা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। তাঁর কারণে বাংলাদেশের অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে। তিনি আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার।

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। দূরদর্শী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাই শুরু থেকেই কৃষি ব্যবস্থার ওপর জোর দিয়েছেন। কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নে তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকার অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যার কারণে খাদ্য উৎপাদনে বাংলাদেশ আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ। বঙ্গবন্ধু দেশের প্রথম বাজেটে ৫০১ কোটি টাকার মধ্যে কৃষি ক্ষেত্রে বরাদ্দ রেখেছিলেন ১০৩ কোটি টাকা। তিনি সবুজ বিপ্লবের ডাক দিয়েছেন। ১৯৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। তখন দেশে ৪০ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি ছিল। ২০০৮ সালে দেশে খাদ্য ঘাটতি ছিল ২৬ লক্ষ টন। শেখ হাসিনা দেশের খাদ্য ঘাটতি দূর করতে দূরদর্শী বিভিন্ন পরিকল্পনা করেন। এর মধ্যে কৃষি খাতকে আধুনিকায়ন করা, কৃষি ও খাদ্য উৎপাদনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান, সারের দাম কমানো, কৃষি গবেষণা বৃদ্ধি, কৃষকদের জন্য ঋণ ব্যবস্থা সহজ করা, প্রযুক্তির ব্যবহার, উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন উল্লেখযোগ্য। ২০০৮-২০০৯ সালে দেশে মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল ৩২৮.৯৫ লক্ষ টন। ২০১৯-২০২০ সালে বাংলাদেশে খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়েছে মোট ৪৩২.১৫ লক্ষ টন। গত দশ-এগারো বছরে ১০৩.২ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপাদন বেশি হয়েছে। দেশজ আয়ের ১৪.১ শতাংশ আসে কৃষি খাত থেকে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও বাংলাদেশের কৃষি খাতের উন্নয়ন হয়েছে। কৃষি খাতে অবদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'সেরেস পদক' প্রদান করেছে জাতিসংঘ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানেন, জনগণকে সুশিক্ষিত না করা গেলে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই তাঁর সরকার বরাবরই শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। বছরের প্রথম দিনে শিক্ষার্থীদের হাতে বিনামূল্যে নতুন বই তুলে দিয়েছেন তিনি। এই উদ্যোগ বিশ্বে প্রশংসিত। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড সূত্রে জানা যায়, ২০২০ সালে প্রায় সোয়া চার কোটি শিক্ষার্থীদের জন্য ৩৫ কোটি ৩১ লাখের বেশি বই বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। ১৯৯০ সালে বাংলাদেশে স্কুলে শিশু ভর্তির হার ছিল ৬১ ভাগ। এখন সেটি ৯৭.৭ ভাগেরও বেশি। সরকার এখন শতভাগ শিশুকে স্কুলমুখী করতে বৃত্তি প্রদান, মিড ডে মিলের ব্যবস্থা করেছে। গত তিন বছরে ২৯৯টি বেসরকারি কলেজকে সরকারি করেছে সরকার। ২০১৯ সালে ২৭৩০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হয়। এটি প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ একটি সিদ্ধান্ত। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে গত ১২ বছরে অবকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে অভাবনীয়। ফলে প্রতিবছরই বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে, ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর হার কমছে। ২০১০ সালে আওয়ামী লীগ সরকার জাতিকে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষানীতি উপহার দিয়েছে। শেখ হাসিনার সরকার সৃজনশীল পাঠ্যক্রম ও কারিগরি শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়ে আসছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভরতা বেড়েছে।

বাংলাদেশ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন করছে। এই ৫০ বছরে দেশের চিকিৎসা খাত অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে। এত স্বল্প খরচে পৃথিবীর কম দেশেই চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। পুষ্টি উন্নয়ন, সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, টিকা কার্যক্রম, শিশুমৃত্যু হার কমানো, কমিউনিটি কার্যক্রমসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে বাংলাদেশ

'উইটসা এমিনেন্ট পারসনস অ্যাওয়ার্ড ২০২১' পুরস্কারে ভূষিত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

রোল মডেল। বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসা বিষয়ক জার্নাল *ল্যানসেট* ২০১৩ সালে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের সাফল্যকে 'এশিয়ার বিস্ময়' বলে আখ্যায়িত করেছে। তবে স্বাস্থ্য খাত ব্যবস্থাপনার আরও উন্নয়ন প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বর্তমানে সেই লক্ষ্যে কাজ করছেন।

বাংলাদেশ এখন তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর সমৃদ্ধ দেশ। শেখ হাসিনা প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক বাংলাদেশ গঠনের কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন। এ কাজে তাঁকে সহযোগিতা করছেন তাঁরই সুযোগ্য পুত্র সজীব আহমেদ ওয়াজেদ। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের কারণে এখন সবার হাতে স্মার্টফোন। ইন্টারনেট সুবিধাও গ্রামগঞ্জে পৌঁছে যাওয়ার ফলে পৃথিবী এখন সবার হাতের মুঠোয়। প্রযুক্তির কল্যাণে কৃষক গ্রামে বসেই খাদ্যশস্যের দরদাম জানতে পারছেন, অসুস্থ হলে টেলিফোনে সেবা নিতে পারছেন, জরুরি প্রয়োজনে বা দুর্ঘটনায় হেল্পলাইনে কল দিয়ে সহযোগিতা নিতে পারছেন। এখন হাতের নাগালেই সবকিছু। তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষে আত্মকর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে, সাধারণ মানুষের মনে সচেতনতা জাগ্রত হয়েছে। শেখ হাসিনার সরকার চতুর্থ শিল্পবিপ্লব মোকাবিলায় তরুণদের গড়ে তুলছেন। এই তরুণরাই একদিন ডিজিটাল বাংলাদেশের নেতৃত্ব দিবে।

২০২০ সালে করোনা মহামারি দেখা দেয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঠিক নেতৃত্বে বাংলাদেশ করোনার বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। বড়ো বড়ো দেশের অর্থনীতি ব্যবস্থা ভেঙে পড়লেও বাংলাদেশের অর্থনীতি গতিশীল বিধায় পদ্মা সেতুর মতো বড়ো কাজ করোনার মধ্যেও হচ্ছে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি না থাকলে পদ্মা সেতুর কাজ চলমান রাখা সম্ভব হতো না। শেখ হাসিনা বুঝতে পেরেছিলেন, করোনা টিকার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। তাই তিনি বাংলাদেশের জন্য টিকা কিনতে অগ্রিম বিনিয়োগ করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করেছেন। বিচার করেছেন বঙ্গবন্ধুর ঘাতকদের। আদালতের রায়ে তাদের ফাঁসি হওয়ার মধ্য দিয়ে দেশ ও জাতি কলঙ্কমুক্ত হলো। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বৈদেশিক শক্তির রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই মহান দায়িত্ব পালন করেছেন। যোগ্য নেতার যোগ্য কন্যা তিনি, এমন সাহস, নেতৃত্ব ও ত্যাগ তাঁকেই মানায়। পদ্মা সেতু থেকে যখন বিশ্বব্যাংক মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল তখন তিনিই বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা দিয়েছিলেন পদ্মা সেতু নিজস্ব অর্থায়নে হবে। তিনি যা বলেছেন তা করে দেখিয়েছেন। আমাদের রিজার্ভ প্রতিবছর বাড়ছে। বর্তমানে দেশে হাজার হাজার কোটি টাকার উন্নয়নমূলক কাজ চলমান রয়েছে। এমন কোনো ক্ষেত্র নেই, যেখানে শেখ হাসিনার সরকার উন্নয়ন করেনি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে এখন বিশ্ব নেতারা গর্ব করে ও সম্মান করে। বঙ্গবন্ধুর পরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে খ্যাতিমান হয়েছেন। বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী নারীনেত্রী আমাদের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা। এই গৌরব আমাদের, তিনি বাংলাদেশের গৌরব। তাঁর হাত ধরে বাংলাদেশ দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাক। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

ড. মোহাম্মদ হাসান খান: অধ্যক্ষ, ফরক্কাবাদ ডিগ্রি কলেজ, চাঁদপুর ও প্রাবন্ধিক, mhk381975@gmail.com

বিনামূল্যে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা

বিনামূল্যে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে বলে জানান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক। সেজন্য ইতোমধ্যে উপজেলা-জেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং ঢাকার ২২টি বিশেষায়িত হাসপাতালে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

১৩ই অক্টোবর দিনাজপুরের বিরল উপজেলার নবনির্মিত মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স উদ্‌বোধন শেষে এক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা জানান। দুই কোটি ৫০ লাখ টাকা ব্যয়ে এ মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়। মন্ত্রী মোজাম্মেল হক বলেন, আমরা 'বীরের কণ্ঠে বীরগাথা' প্রকল্প হাতে নিয়েছি। কিছু দিনের মধ্যে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতা রেকর্ড এবং সংরক্ষণ করা হবে। তিনি বলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ডিজিটাল সার্টিফিকেট ও পরিচয়পত্র প্রদানের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

মন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যথাযথ মর্যাদা এবং সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ৩০ হাজার বীরনিবাস নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া গত সাত বছরে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানি ভাতা তিন হাজার টাকা থেকে ২০ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। মন্ত্রী এসময় বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড তুলে ধরেন এবং নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে নিজেদের যোগ্য করে গড়ে তুলতে আহ্বান জানান।

প্রতিবেদন: প্রতাপ রায়

অবিনাশী জয় বাংলা

শ্যামল কুমার সরকার

জয় বাংলা, বাংলাদেশ, স্বাধীনতা আর বঙ্গবন্ধু– শব্দগুচ্ছ একই মালায় গাঁথা ফুল। ফলে এর একটিকে বাদ দিলে মালার সৌন্দর্য নষ্ট হয়। তবুও দীর্ঘ টানা একুশ বছর জবরদস্তি করে 'জয় বাংলা' ধ্বনিকে নির্বাসনে রাখা হয়েছিল। তবে হাজারো চেষ্টা করেও শেষ রক্ষা হয়নি। প্রমাণিত হয়েছে বন্দুকের নলে সাময়িক সময়ের জন্য মানুষকে দমিয়ে রাখা যায়। কখনোই চিরতরে নয়। তাইতো এখন বাংলার আকাশে বাতাসে লাখো কোটি কণ্ঠস্বরে নিত্য ধ্বনিত হচ্ছে প্রাণের 'জয় বাংলা'। তবে বাঙালির অতি প্রিয় স্লোগান 'জয় বাংলা' রাতারাতি আমাদের মনে স্থায়ী হয়নি। এজন্য দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। আমাদের জাতীয় কবি, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'বাঙালীর বাংলা' প্রবন্ধে লিখেন–

> বাঙালীকে, বাঙালীর ছেলেমেয়েকে ছেলেবেলা থেকে শুধু এই মন্ত্র শেখাও; ...
> বাংলা বাঙালীর হোক। বাংলার জয় হোক। বাঙালীর জয় হোক। জয় বাংলা বাঙালার জয়।

কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর *ভাঙ্গার গান* কাব্যগ্রন্থে 'পূর্ণ-অভিনন্দন' কবিতায় হুবহু 'জয় বাংলা' শব্দবন্ধটি প্রথম ব্যবহার করেন। তিনি লিখেন, '... জয় বাংলার পূর্ণচন্দ্র, জয় জয় আদি-অন্তরীণ।'

১৯৭০-এর নির্বাচনের আগে বঙ্গবন্ধু ময়মনসিংহে গিয়েছিলেন। শহরের প্রধান সড়কের রামবাবু রোডে বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব মফিজ উদ্দিন আহমদের বাসার আঙিনায় ছোট্ট একটি অনির্ধারিত ভাষণ দিয়েছিলেন তিনি। এর পরের চা পর্বে একজন বঙ্গবন্ধুকে প্রশ্ন করেছিলেন, নির্বাচনে 'জয় বাংলা' স্লোগান থাকবে কি না। এতে বঙ্গবন্ধু বেশ উত্তেজিত হয়ে বলেন, 'যারা জয় বাংলা স্লোগান দিতে অসম্মতি জানাবে তাদের আমাদের দলে থাকবার প্রয়োজন নেই'।

স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তি 'জয় বাংলা' স্লোগানে কৌশলে কলঙ্ক সেঁটে দিতে চেয়েছে। ষড়যন্ত্রকারীরা সহজ-সরল বাঙালির মনে ধর্মীয় বিভেদ ঢুকিয়ে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়।

১৯৬৯-এর গণ-আন্দোলনের পর *জয় বাংলা* নামে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন ফখরুল আলম। কিন্তু পাকিস্তানি প্রশাসন সেটি প্রদর্শনের অনুমোদন দেয়নি। ১৯৭২ সালের ২৬শে জানুয়ারি ছবিটি মুক্তি পায়। সে ছবিতে গাজী মাজহারুল আনোয়ারের লেখা একটি গান ব্যবহৃত হয়েছিল, যা ১৯৭০-এর আগে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। পরবর্তীকালে গানটি বিবিসি'র জরিপে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বিশটি বাংলা গানের একটি হিসেবে স্বীকৃতি পায়। আলোচিত গানটির বাণী ছিল–

> জয় বাংলা বাংলার জয়
> হবে হবে হবে হবে নিশ্চয়
> কোটি প্রাণ এক সাথে জেগেছে অন্ধ রাতে
> নতুন সূর্য উঠার এই তো সময় ॥ ...
> অন্ন চাই বস্ত্র চাই বাঁচার মতো বাঁচতে চাই
> অত্যাচারী শোষকের আজ মুক্তি নাই মুক্তি নাই মুক্তি নাই।

১৯৭০-এর নির্বাচনের আগে ও পরে, এমনকি নির্বাচনে 'জয় বাংলা' স্লোগানে বাংলার জনপদ ছিল উত্তাল। বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে 'জয় বাংলা' স্লোগান শোনার আগে জনতা এর গুরুত্ব ততটা উপলব্ধি করেনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক

বর্তমানে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি)'র বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন তাঁর এক বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধুর প্রথম 'জয় বাংলা' স্লোগান দেওয়ার বিষয়ে বলেন–

> ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৯। মধুর ক্যান্টিনে ছাত্রলীগের সভা হচ্ছিল। আফতাব উদ্দিন আহমদ ছিলেন সূর্যসেন হলের ছাত্র। সভা চলাকালীন একপর্যায়ে তিনি হঠাৎ করে স্লোগান দিলেন 'জয় বাংলা'। ঘটনার আকস্মিকতার রেশ কাটিয়ে উঠে ইকবাল হলের আরেক শিক্ষার্থী চিশতি শাহ হেলালুর রহমান চিৎকার করে বলে ওঠেন 'জয় বাংলা'। ১১ই জানুয়ারি ১৯৭০। সেদিন পল্টন ময়দানে আওয়ামী লীগের একটি সভা ছিল। সেই সভায় একমাত্র বক্তা ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। মঞ্চের সামনের দিকে 'জয় বাংলা' লেখা একটি ব্যানার ছিল। বঙ্গবন্ধু আসার পথে ছাত্রনেতা সিরাজুল আলম খান বেশ কয়েকবার 'জয় বাংলা' স্লোগান দিলেন। তখন পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু নিজে 'জয় বাংলা' স্লোগান দেননি। ৬ই মে ১৯৭০। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাকসু নির্বাচন হচ্ছিল। সেদিন ছাত্রলীগের কর্মীরা একে অপরকে সম্বোধন করছিল 'জয় বাংলা' বলে। ৭ই জুন ১৯৭০। সেদিন রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগের সভা ছিল। আ স ম আব্দুর রবের নেতৃত্বে সেই কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণকারীদের টুপিতে সেফটিপিন দিয়ে আটকানো ছিল এই স্লোগানটি। এই সভায় বঙ্গবন্ধু সর্বপ্রথম নিজ মুখে উচ্চারণ করলেন 'জয় বাংলা'।

পরে এই স্লোগান দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে সবার মাঝে। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধারা রণধ্বনি হিসেবে 'জয় বাংলা' ব্যবহার করতেন। এই হলো বাঙালির অহংকার 'জয় বাংলা' ধ্বনির গৌরবময় ইতিহাস। এ আমাদের অসামান্য অর্জন। কোনোভাবেই যেন আমরা হেলাফেলায় এ অর্জন নষ্ট না করি, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

'জয় বাংলা' কখনোই শুধু দলীয় স্লোগান হতে পারে না। 'জয় বাংলা' সমগ্র বাঙালির স্লোগান, দেশবাসীর স্লোগান। সম্প্রতি হাইকোর্ট 'জয় বাংলা' স্লোগানকে জাতীয় স্লোগান হিসেবে স্বীকৃতির কথা বলেছে। 'জয় বাংলা' স্লোগানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান শুরু ও শেষ করতে বলেছে। বিষয়টি অত্যন্ত যৌক্তিক। অতি দ্রুত এর আইনি ভিত্তি দাঁড় করাতে হবে। তাহলেই মহান মুক্তিযুদ্ধ, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদদের প্রতি প্রকৃত সম্মান প্রদর্শন করা হবে। 'জয় বাংলা' স্লোগান নিজে ধারণ করে নতুন প্রজন্মকে এর ইতিহাস জানাতে হবে। স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তকে 'জয় বাংলা' স্লোগানের গুরুত্ব তুলে ধরতে হবে। ভুলে গেলে চলবে না যে, 'জয় বাংলা' স্লোগান হারিয়ে গেলে হারিয়ে যাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্য। আমরা তা হতে দিতে পারি না। জয় বাংলা, বাংলার জয় হোক।

শ্যামল কুমার সরকার: সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ইংরেজি বিভাগ, ঝিটকা খাজা রহমত আলী কলেজ, হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ

সবুজায়ন ঢাকার বিকল্প নেই

আলী হাসান

স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সুস্থভাবে বাঁচার এবং সুস্থ চিন্তার পরিচায়ক। আর স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সৃজনে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার কোনোই বিকল্প থাকতে পারে না। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে প্রয়োজন সর্বব্যাপী বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে সবুজায়ন। এর জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সচেতনতা। সকলের সচেতনতায় সবুজায়নের মাধ্যমে বিশ্বের অপরাপর মহানগরীর সমান্তরালে কীভাবে ঢাকা মহানগরীকে আবাসন উপযোগী করে গড়ে তোলা যায়, সেটা এখন এক বিরাট প্রশ্ন হিসেবে দেখা দিয়েছে। কেননা, নগর জীবনের বাস্তবতায় সবুজায়নের ভূমিকাকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। কীভাবে সবুজায়ন ঢাকা মহানগরীর নাগরিক জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে সে বিষয়টি ভাবা এখন অপরিহার্য হিসেবে দেখা দিয়েছে।

অনুধাবন করতে হবে যে, এখানে দুটি বিষয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। একটি হচ্ছে সবুজায়ন, অপরটি হচ্ছে ঢাকা মহানগরীর নগরায়ণের ক্ষেত্রে এর বাস্তবতা। ঢাকার আবাসিক পরিবেশ বর্তমানে কতটুকু স্বাস্থ্যসম্মত আছে, এর মধ্যে প্রকৃতির সাথে বা সবুজায়নের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো ভারসাম্যমূলক অবস্থা আছে কি না বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মনে রাখতে হবে, এখন বিশ্বে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হচ্ছে 'জলবায়ু পরিবর্তন'। এখনও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ক্ষুধা আছে, দারিদ্র্য আছে, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা আছে, যুদ্ধ আছে, প্রাকৃতিক মহামারি আছে। তারপরও সকলের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টার্ম হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপারটি। এর কারণ হচ্ছে মানুষ যদি টিকেই না থাকতে পারে, শারীরিক ও মানসিকভাবে যদি সুস্থই না থাকতে পারে, পৃথিবী থেকে মানব সভ্যতা যদি হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয় তাহলে পৃথিবীটা এগিয়ে যাচ্ছে– একথা বলার কোনো অর্থ হয় না। পৃথিবীব্যাপী যেভাবে উষ্ণতা বাড়ছে এবং প্রতিনিয়ত যেভাবে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে অচিরেই এশিয়ার ছোট্ট একটি দেশ মালদ্বীপসহ পৃথিবীর বহু স্থলভাগ পানির নিচে তলিয়ে যাবে। কোটি মানুষ এর ফলে আশ্রয়হীন ও জলবায়ু উদ্বাস্তু হয়ে পড়বে এবং এটা বাংলাদেশের জন্য ভয়াবহ বিপদ ডেকে আনবে। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন রোগের উপসর্গ দেখা দিচ্ছে। প্রতিবছর উষ্ণতা বৃদ্ধি, এর ফলে অসহ্য গরম অনুভূতি, তীব্র বন্যা, অতিবৃষ্টি কিংবা অনাবৃষ্টি, ঝড়-সাইক্লোন-সিডর ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো ভয়াবহ আকারে দেখা দিচ্ছে– এই সবই জলবায়ু পরিবর্তনের কুফল। সবচেয়ে আতঙ্কের ব্যাপার হচ্ছে, বিজ্ঞানীরা ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে দুর্যোগ ধেয়ে আসার যে নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিচ্ছে, আসলে সে সময়ের অনেক আগেই সেসব দুর্যোগ সব কিছুকে গ্রাস করে ফেলছে।

জলবায়ু পরিবর্তনটা হচ্ছে মূলতই কার্বন নিঃসরণ এবং তৎসংশ্লিষ্ট উদ্ভূত তাপের মাধ্যমে। এই কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস মূলত মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর জীবন ধ্বংসের মূল কারণ। এই গ্যাসের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ যদি মানব দেহে প্রবেশ করানো যায়, তাহলে তিন থেকে চার মিনিটের মধ্যেই তার মৃত্যু ঘটবে– এটা এত ভয়াবহ। সুতরাং মানবসমাজ, প্রাণিকুল আর বিপন্ন প্রকৃতি রক্ষাকল্পে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও উদ্ভূত তাপ নিঃসরণকে অতিদ্রুত সহনীয় মাত্রায় আনতে হবে। এটা একেবারে বন্ধ বা নিঃশেষ করা যাবে না কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করা যাবে এবং সহনীয় পর্যায়ে আনা যাবে। মানুষ থেকে শুরু করে প্রতিটি প্রাণীই কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করছে, তারা নিশ্বাসে অক্সিজেন গ্রহণ করছে। সবচেয়ে বেশি কার্বন নিঃসরণ করছে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন মিল-ফ্যাক্টরি-কারখানা এবং বহুজাতিক গ্যাস-পেট্রোলিয়াম খনিজদ্রব্য উত্তোলনকারী কোম্পানিগুলো। এক গবেষণায় দেখা গেছে, গত পঞ্চাশ বছরে এক-তৃতীয়াংশ বায়ুদূষণ করছে বিশ্বের বিশটি কোম্পানি। এদের মধ্যে শেল, সেভরন, ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম, আরামকো, নাইকোসহ ভারী শিল্পের দেশগুলো এবং পশ্চিমা বিশ্বের বহুজাতিক কোম্পানিগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করছে এই পৃথিবীর। অর্থাৎ গত পঞ্চাশ বছরে পৃথিবীর ভারসাম্যমূলক পরিবেশের যত ক্ষতি হয়েছে তার তেত্রিশ থেকে চল্লিশ ভাগ ক্ষতি হয়েছে হাতেগোনা এই কয়েকটা কোম্পানির কারণে। এখনকার বাস্তবতায় অবশ্য সবচেয়ে বেশি কার্বন নিঃসরণ করছে চায়না এবং ক্ষতিকর এই কার্বন মূলত দুটি গ্যাসের সমন্বয়– একটি কার্বন ডাইঅক্সাইড, অন্যটি কার্বন মনোঅক্সাইড। কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হচ্ছে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর প্রশ্বাস থেকে আর কার্বন মনোঅক্সাইড তৈরি হচ্ছে মিল-ফ্যাক্টরি-খনিজ উত্তোলন ও গাড়ির পেট্রোল পোড়া ধোঁয়া এবং প্লাস্টিক বা প্লাস্টিকজাত পলিথিন ও পলি-ইথিলিন অর্থাৎ যা থেকে প্রচণ্ড রকমের ধোঁয়া উৎপন্ন হয়। মূল কথা হলো, ইঞ্জিন সেটা গাড়ি হোক কিংবা কলকারখানা হোক তা থেকেই ক্ষতিকর কার্বন মনোঅক্সাইড উৎপন্ন হয়। কার্বনের অপর নাম বিষ। আমরা যত বেশি কার্বন উৎপন্ন করব তত বেশি মৃত্যু ডেকে আনব। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এখন বিশ্বে যে পরিমাণ উষ্ণতা

বিরাজ করছে এবং তার ফলে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছি, এই উষ্ণতা হতে মাত্র এক থেকে দেড় ডিগ্রি তাপমাত্রা যদি কমানো যায় তাহলে পৃথিবী তিরিশ বছর আগের ন্যাচারাল তাপমাত্রা ফিরে পাবে। আর এটা হলে প্রাকৃতিক বিপদের আশঙ্কাও অনেক কমে যাবে।

পরিবেশ দূষণের হাত থেকে বাঁচতে উন্নত বিশ্ব এ মুহূর্তে বেশ কিছু কার্যকরী পদক্ষেপ নিচ্ছে এবং সে প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশেও অনেক কিছু হচ্ছে। তবে এটা স্বীকার করতে হবে যে, বিশ্বব্যাপী পরিবেশের যে বিপর্যয় সেটার আসল কারণও কিন্তু তারা নিজেরাই। তবে এ থেকে একদিকে তারা যেমন বের হওয়ার চেষ্টা করছে অন্যদিকে নবায়নযোগ্য বিকল্প শক্তির উৎসগুলো তারা কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে। ইদানীং দেখা যাচ্ছে, কোনো কোনো শহরে এমন বিল্ডিং তারা তৈরি করছে যে, ঐ বিল্ডিংয়ে ব্যবহৃত ইলেকট্রিসিটি বাইরে থেকে আনতে হবে না। ঐ বিল্ডিংয়ের দেয়াল বা ছাদ থেকেই তা উৎপন্ন হবে। বিল্ডিংটা ঐ রকমভাবেই ডিজাইন করা। টেসলা নামক একটা প্রাইভেট কার চালু হয়েছে যে গাড়িটা চলছে তার নিজস্ব উৎপাদিত শক্তি থেকেই বাইরে থেকে কোনো জ্বালানি গাড়িতে ভরতে হচ্ছে না। নির্দিষ্ট গতিতে চলার জন্য গাড়িটি তার নবায়নযোগ্য শক্তি নিজের বডি থেকেই উৎপন্ন করছে। বলার বিষয় এটা যে, উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যে ক্রাইসিস দেখা দিচ্ছে, সেটা তারা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী হয়ত সার্বাইভও করতে পারছে কিন্তু আমরা তো এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অসহায়।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রাজধানী ঢাকা তার ধারণ ক্ষমতার চেয়েও বেশি পরিমাণে মানুষ, আবাসন, গাড়ি ইত্যাদি ধারণ করছে। এর ফলে মারাত্মক পরিবেশ দূষণ হওয়াই স্বাভাবিক। মাত্রাতিরিক্ত পরিবেশ দূষণের হাত থেকে আমাদের উত্তরণের কোনো বিকল্প নেই। মনে রাখতে হবে, ঢাকা বাংলাদেশের শুধু প্রধান শহরই নয়, ঢাকা বাংলাদেশকে বহির্বিশ্বে রিপ্রেজেন্টও করে। এই ঢাকা এক সময় সবুজে সবুজে ঢাকা ছিল। কিন্তু পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় একদিকে স্বাধীনতা-পরবর্তী সরকারগুলোর ব্যর্থতা অন্যদিকে সাধারণ নাগরিকদের এ ব্যাপারে সচেতনতার খুবই অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। ফলে সবুজে সবুজে ঢাকা নগরী এখন ইট-কাঠ-ইমারতের জঞ্জালে পরিণত হয়েছে। এটা হয়েছে সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে। এই মহানগরীতে বসবাসকারী কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তিই এই দায়কে অস্বীকার করতে পারবে না। একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, একটি গাছ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে অক্সিজেন উৎপাদন করছে আর মানুষ সেই অক্সিজেন গ্রহণ করে বেঁচে থাকছে। এখন এই শহরে বসবাসকারী প্রায় দুই কোটি মানুষ যে পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসরণ করছে এবং পাশাপাশি মিলকারখানা থেকে বের হওয়া দূষিত ধোঁয়াসহ লক্ষ লক্ষ গাড়ি থেকে নির্গত বিপুল পেট্রোল আর ডিজেলপোড়া ধোঁয়া বাতাসে মিশে গিয়ে যে পরিমাণ কার্বন পরিবেশে জমা হচ্ছে, তা ঢাকার এই স্বল্প পরিমাণ বৃক্ষ কোনোভাবেই গ্রহণ করে পেরে উঠছে না। অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি, এই শহরে প্রতিদিনের উৎপাদিত দূষিত বায়ুকে পরিশোধন করে অক্সিজেনে রূপান্তর করার জন্য ন্যূনতম যতগুলো গাছ থাকা প্রয়োজন তার এক দশমাংশও নেই। ফলে ক্রমাগত ঢাকা মহানগরীর বায়ুদূষণ তথা পরিবেশ বিপর্যয় বেড়েই চলছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, মানব স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর সিসা নামক একটি রাসায়নিক উপাদান ঢাকার বাতাসে যে পরিমাণ রয়েছে তা বিশ্বের আর কোনো মেগাশহরে খুঁজে পাওয়া যায় না। নিঃসন্দেহে এটি আমাদের জন্য চরম উদ্বেগের।

এই চরম উদ্বেগজনক পরিস্থিতি থেকে দ্রুতই আমাদের বের হয়ে আসতে হবে। এখনই এ বিষয়ে সকলের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন, আরও সচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন। এ ব্যাপারে নগরীতে সবুজায়নের যথাযথ পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে এবং তা দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। সুন্দর ও সুস্থভাবে বাঁচতে পরিবেশ রক্ষায় সকলের সচেতনতার কোনোই বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষকে এবং ব্যক্তি পর্যায়ে সকল সাধারণ নাগরিককে একইসঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে। রাস্তার ধারে, রোড আইল্যান্ডে, লেকের পাড়ে, পার্কে এবং ঢাকার চারপাশ ঘিরে কয়েক লক্ষ বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে সবুজায়ন ঘটাতে হবে দ্রুত। না হলে ঢাকা শহরকে বাঁচানো যাবে না। অন্যদিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ব্যক্তি পর্যায়ে সচেতনতা বাড়াতে হবে সর্বোচ্চ পর্যায়ে। একজন বাড়ির মালিককে তার বাড়ির ডিজাইনের মধ্যেই বৃক্ষরোপণের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা রেখে অতঃপর ডিজাইন সম্পন্ন করতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের এ সংক্রান্ত নীতিমালাকে কঠোর হস্তে বাস্তবায়ন করতে বাধ্য করতে হবে। বাড়ির আঙিনায় কিংবা আশপাশে স্থায়ী বৃক্ষরোপণ ছাড়াও বারান্দায়, বেলকনিতে প্রচুর সংখ্যক টবের মধ্যে নানা ধরনের অস্থায়ী বৃক্ষরোপণ করতে হবে। এছাড়া ছাদের উপরে টব ছাড়াও বড়ো বড়ো ড্রামের মধ্যে বিভিন্ন ফলজবৃক্ষ ও সৌন্দর্যবর্ধন করে বৃক্ষরোপণ এবং নিয়মিতভাবে এর পরিচর্যা করতে হবে। গাছ শুধু লাগালেই হবে না, সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিকভাবে এর রক্ষণাবেক্ষণও করতে হবে। ব্যক্তি পর্যায়ে এসব স্থায়ী ও টবে লাগানো অস্থায়ী বৃক্ষ একদিকে যেমন সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে আনন্দ দিবে, অন্যদিকে ঢাকা নগরীকে সবুজায়ন করতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। মনে রাখতে হবে, বৃক্ষ হচ্ছে পরিবেশের ফুসফুস। ফুসফুস ছাড়া যেমন মানুষ বাঁচতে পারে না, ঠিক তেমনি পর্যাপ্ত বৃক্ষ ছাড়া কখনও পরিবেশের ভারসাম্যও রক্ষা হয় না। আরেকটি কথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বিল্ডিং ও অন্যসব কনস্ট্রাকশন কাজে এমন ধরনের উপাদান-উপকরণ ব্যবহার করতে হবে, যেটা সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব। এক্ষেত্রে সিমেন্ট, ইট, কংক্রিটের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা মানুষের প্রয়োজনেই। জীবনকে ভালোবাসলে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হতেই হবে। এ ব্যাপারে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ছোটোবেলা থেকেই পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করতে হবে এবং বিষয়টিকে তাদের পাঠ্যসূচিরও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। মানুষ সুস্থ থাকলেই কেবল সুস্থ চিন্তা ও আগামীর ভবিষ্যৎ গড়তে সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখতে এবং সেসব স্বপ্নের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন করতে পারে। সম্ভাবনাময় আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর বাসযোগ্য নগরী গড়তে এবং বিশ্বের অপরাপর মেগাসিটির সাথে জীবনযাপনের একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ ও ভারসাম্যমূলক অবস্থান তৈরি করতে অনতিবিলম্বে সংশ্লিষ্ট সকলকে ঢাকা নগরীর সবুজায়নে এগিয়ে আসতে হবে।

আলী হাসান: ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

শুদ্ধাচার করলে লালন
আলোকিত হবে জীবন

ছয় দফা কর্মসূচি ব্যাখ্যা করে জাতির উদ্দেশে বেতার ও টেলিভিশনে ভাষণ দানরত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯৭০), আলোকচিত্র: শিল্পী লুৎফর রহমান

লুৎফর রহমানের ক্যামেরায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু

আপন চৌধুরী

বঙ্গবন্ধুর স্নেহধন্য বিশিষ্ট আলোকচিত্রী লুৎফর রহমানের জন্ম ১৯২৬ সালের ২০শে ডিসেম্বর ব্রিটিশ ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে। কিছুকালের মধ্যেই তাঁর পিতা সপরিবার রাজশাহীতে চলে আসেন। তাঁর শৈশব, কৈশোর ও তারুণ্যের সোনালি দিনগুলো কেটেছে রাজশাহী মহানগরীর কেন্দ্রস্থল বড়কুঠি এলাকায়। যৌবনেই ছবি তোলাটা তাঁর একটা শখের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। চাকরি জীবনের শুরুতে তিনি ব্রিটিশ এয়ারফোর্সে চাকরি করতেন। ছবি তোলার নেশায় চাকরি ছেড়ে আজীবন ফটোগ্রাফিতেই যুক্ত থাকেন তিনি। ১৯৬০ সালে লুৎফর রহমান চাকরি ও জীবিকার সন্ধানে রাজশাহী ছেড়ে ঢাকায় আসেন। মহাখালীতে নিজের ঠিকানা গড়ে নেন স্থায়ীভাবে, যেখানে আমৃত্যু তিনি ছিলেন। মহাখালীতে 'প্রতিচ্ছবি' নামে নিজস্ব ফটোগ্রাফি স্টুডিও স্থাপন করেন ১৯৬২ সালে। এই স্টুডিও থেকে প্রিন্ট হতে থাকে লুৎফর রহমানের ক্যামেরায় তোলা সেই সময়ের চলচ্চিত্রাঙ্গন, রাজনৈতিক পরিমণ্ডল ও সংস্কৃতি অঙ্গনের বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের অজস্র ছবি। ষাটের উত্তাল সময়ের বহু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ব্যক্তিগত জীবনের নানা ঘটনা লুৎফর রহমানের ক্যামেরায় মূর্ত হয়ে উঠেছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উত্তাল ভাষণের ঐতিহাসিক মুহূর্তগুলো এখনো প্রাণবন্ত হয়ে আছে তাঁর ছবির অ্যালবামে। ১৯৬৬ সালে বাংলাদেশ বেতারে প্রথম চাকরি নেন তিনি। এরপর বিভিন্ন সময়ে শিল্পকলা একাডেমি, এফডিসি, বিটিভি, ডিআইটি, শিশু একাডেমি, জাতীয় জাদুঘর প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের হয়ে কাজ করেন ফটোগ্রাফার লুৎফর রহমান। বঙ্গবন্ধুর প্রয়াণের আগ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সাথে ফটোসাংবাদিক লুৎফর রহমানের ঘনিষ্ঠতা অক্ষুণ্ন ছিল। ক্যামেরাযোদ্ধা লুৎফর রহমান ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বেতার ও টেলিভিশনে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের ছবি, ১৯৭১-এর ৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণসহ মহান মুক্তিযুদ্ধের অসংখ্য ছবি তুলেছেন।

লুৎফর রহমান বিভিন্ন সময়ে তাঁর স্মৃতিচারণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে বলেছেন–

> সময়টা ছিল ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের প্রস্তুতির সময়। রাজশাহীতে আমাদের এলাকা থেকে নির্বাচনে প্রার্থী হন প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী ও আদিবাসী সাগারাম মাঝি। আমি ঐ সময় প্রায়ই ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে সাইকেল নিয়ে ঘুরে বেড়াতাম। ছবি তোলাই তখন আমার নেশা। ... উত্তেজনায় কাটালাম এই ভেবে যে, কখন নেতারা আসবেন। কখন আমি তাঁদের ছবি তোলার সুযোগ পাবো। পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে তাঁরা আসেন। আমিও নানা ভঙ্গিমায় তাঁদের অনেক ছবি তুলি। মনে পড়ে বঙ্গবন্ধু আমাকে বলেছিলেন, 'ছবি ভালো হলে আমাদের অবশ্যই কপি দিতে হবে, আমাদের পত্রিকায় ছাপাবো।' সেটিই ছিল বঙ্গবন্ধুকে আমার প্রথম দেখা।
>
> এরপর তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় ১৯৭০-এর নির্বাচনের দিন। তখন আমি ঢাকার স্থায়ী বাসিন্দা। বিয়ে করে সংসারও হয়েছে। আমার বড়ো মেয়ে কদিন ধরে ছিল অসুস্থ। তার জন্য কিছু ফল কিনতে যাই গুলিস্তানে। স্বভাববশত আমার কাঁধে ছিল ক্যামেরা। ফলের দোকানের পাশেই রাস্তার ওপারে একটি প্রেসের উপর তলায় ছিল আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় অফিস। ফল কিনে নিয়ে নির্বাচনের খবর জানার জন্য আওয়ামী লীগ অফিসে যাই। গিয়ে দেখি সেই ১৬ বছর আগে দেখা আজকের দেশবরেণ্য নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অফিসে বসে আছেন। যে আসছে তাকেই তিনি নির্বাচনের খবর জিজ্ঞাসা করছেন। এর মধ্যেই হঠাৎ আমার হাতের পোটলার দিকে নজর গেল তাঁর। আমাকে খুব আপন ভেবে বললেন, 'ওটার মধ্যে কী রে?' আমি বললাম, আমার মেয়ে অসুস্থ তাই তার জন্যে কিছু কমলা কিনে নিয়ে যাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে উঠলেন, 'আরে ধেৎ আমি এখানে পিপাসায় ছটফট করছি, আর তুই বাসায় নিয়ে যাচ্ছিস কমলা। দে-দে ওটা আমাকে দে।' আমি ঠোঙাটা বঙ্গবন্ধুর হাতে তুলে দিলাম। তিনি একটার পর একটা কমলা খেয়ে চললেন। আমি তাঁর কমলা খাওয়া অবস্থায় গোটা কয়েক ছবি তুললাম। তারপর বিদায় নিয়ে বাসায় যাওয়ার উদ্দেশে রওনা হলাম। আমার পকেটে তখন গাড়ি ভাড়া ছাড়া আর একটি পয়সাও নেই। স্ত্রী আর অসুস্থ মেয়েকে গিয়ে কী বলব মনে মনে তাই ভাবছি। নিচে নামার জন্য আওয়ামী লীগ অফিসের সিঁড়িতে পা রাখতেই অপরিচিত এক লোক কয়েক ডজন কমলার একটি বড়ো ঠোঙা আমার হাতে তুলে দিলেন। আমি তো বিস্ময়ে হতভম্ব। এমন সময় বঙ্গবন্ধু উঁচু গলায় বলে উঠলেন– 'আমার হয়ে তোর মেয়েকে দিস।' এক অপ্রতিরোধ্য আবেগে আমার চোখে সাথে সাথে পানি এসে গেল। এরপর বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ। বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির বাসায় পৌঁছে দেখি তিনি খুব ব্যস্ত। বাইরের কক্ষে বসে নানা বিষয়ে পাকিস্তানিদের সঙ্গে তাঁর উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় চলছে। আমাদের দেখেই বললেন, 'যা ভেতরে গিয়ে বোস। এখন সময় নেই।' আমরা ভেতরের রুমে গিয়ে বসলাম।... বঙ্গবন্ধু বললেন, 'ঠিক আছে ওরা তো আমারই ছেলে, কিছু না থাকলে মুড়িই অন্তত দাও।' এই ছিলেন মানুষের প্রতি গভীর মমতায় ভরা মনের অধিকারী বঙ্গবন্ধু।
>
> মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পর বঙ্গবন্ধুকে একনজর দেখার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি বাংলাদেশে আসতেন। এদের মধ্যেই একদিন এলেন ভারতের একজন প্রভাবশালী মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী। তার সাথে আমারও

পরিচয় হলো। আমি তাকে আমার তোলা বঙ্গবন্ধুর অনেক ছবি দেখালাম। এর মধ্যে একটি ছিল বঙ্গবন্ধুর চা পানের ছবি। সেটি তাকে দেওয়ার জন্য তিনি খুব পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। এমনকি এ ছবির বিনিময়ে আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দেওয়ারও অফার দিলেন। বঙ্গবন্ধুর এত সুন্দর সুন্দর ছবি থাকতে ঐ চা পানের ছবিটির প্রতি ভদ্রলোকের এত দুর্বলতা কেন? আমার কেমন যেন সন্দেহ হলো। খুব করে জিজ্ঞাস করতেই তিনি বললেন, 'ছবিটি আমি চায়ের বিজ্ঞাপনে কাজে লাগাবো।' ভদ্রলোকের কথা শুনে আমার মাথা গরম হয়ে গেল। ছবি দেওয়ার প্রস্তাব এবার পুরোপুরি নাকচ করে দিয়ে বললাম, 'যত টাকা দিন এ ছবি আমি দেব না। আমার মহান নেতা বাঙালি জাতির পিতাকে আমি চায়ের বিজ্ঞাপনে ব্যবহার হতে দিতে পারি না'।

স্বাধীনতার পর ভারত থেকে বাংলাদেশে ঘুরতে এলেন বাংলা গানের কালজয়ী কণ্ঠশিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। বাংলাদেশ বেতারে প্রচারের জন্য তাঁর গাওয়া কিছু গান তখন রেকর্ড করা হলো। রেকর্ডিংয়ের পর বেতারের তৎকালীন আঞ্চলিক পরিচালক কামাল লোহানীর কক্ষে তাঁকে আপ্যায়িত করা হলো। জনাব লোহানীর সাথে আলাপচারিতার ফাঁকে শ্রী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বঙ্গবন্ধুর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদনের বাসনা ব্যক্ত করলেন। আমরা তাঁকে নিয়ে সদলবলে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে চলে গেলাম। বঙ্গবন্ধু সামনে আসতেই তিনি সশ্রদ্ধচিত্তে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে উদ্যত হলে বঙ্গবন্ধু তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'একি করছেন হেমন্ত বাবু, যাঁর গান শোনার জন্য দেশ-বিদেশের অগণিত মানুষ পাগল, সেই আপনি আমার মতো একজন নগণ্য ব্যক্তিকে প্রণাম করে আমাকেই লজ্জা দিলেন।' এর জবাবে শ্রী মুখোপাধ্যায় গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, 'আপনি লজ্জিত হবেন কেন, বাঙালি জাতির পিতাকে প্রণাম করতে পেরে আমিই বরং ধন্য হলাম।'

গণতন্ত্রের সৈনিক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জনমত যাচাইয়ে ১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চ সাধারণ নির্বাচন দিলেন। সে নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু ধানমন্ডির একটি বুথে নিজের ভোট দিবেন। এ ছবি তোলার জন্য আমি অস্থির হয়ে উঠলাম। কিন্তু সবাই আমাকে নিষেধ করতে লাগল। কারণ তখন আর আমি চোখে দেখি না। দুচোখেই ছানি পড়ে গেছে। একটা চোখে অল্প দেখতে পাই। তাও ঝাপসা। তাই কারও বাধা না শুনে আমার পরিচিত একজনের হাত ধরে চলে যাই ধানমন্ডির নির্ধারিত ঐ ভোট বুথে। শত শত দেশি-বিদেশি ক্যামেরাম্যান প্রস্তুত। বঙ্গবন্ধু ব্যালট বাক্সে ভোট দেবেন সেই ছবি তোলার জন্য উন্মুখ। ভোট কেন্দ্রে আসার সাথে সাথে ফ্লাশের ঝলকানি আর ধাক্কাধাক্কি শুরু হলো। আমিও আমার জায়গা হারিয়ে ফেললাম। ক্যামেরা থেকে পড়ে গেল লেন্স। তাই বঙ্গবন্ধুর বিপরীত দিক থেকে তাঁর ছবি তোলার সিদ্ধান্ত নিলাম এবং বঙ্গবন্ধুর ভোট দেওয়ার ছবিও তুললাম। ছবিটা এতই ভালো হলো যে, পত্রপত্রিকা এখন পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর ঐ ছবিটাই ছাপে।

লুৎফর রহমান ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের রাজনীতি ও বঙ্গবন্ধু সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের ছবি তুলেছেন। বঙ্গভবনে অনেক রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে তিনি ছিলেন নিয়মিত। সেখানে লুৎফর রহমান বিভিন্ন দেশি-বিদেশি স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বকে কাছ থেকে দেখেছেন। অনেকের সাথে পরিচিত হন। সবাইকে নিজ ক্যামেরায় ধরে রাখেন। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর ছবিসহ পাঁচ টাকা ও দশ টাকার নতুন ব্যাংক নোট ছাপাবার জন্য চিত্রগ্রাহকদের কাছে ছবি চাওয়া হলো। লুৎফর রহমান ১৯৭০ সালে ডিআইটি ভবনে তোলা বঙ্গবন্ধুর একটি ছবি জমা দেন। লুৎফর রহমানের সেই ছবিটি নির্বাচিত হলো। বাংলাদেশ সরকারের প্রথম পাঁচ টাকা ও দশ টাকার নোটে মুদ্রিত বঙ্গবন্ধুর পোর্ট্রেট ছবি তুলে উপহারস্বরূপ টাকা মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান ব্রাডবুরি উইলকিংসন অ্যান্ড কোম্পানি থেকে একটি ব্র্যান্ডনিউ Yashica Mat 124G ক্যামেরা পুরস্কার পান ফটোগ্রাফার লুৎফর রহমান। সাথে লন্ডনের বুটস, হ্যাডরোডস কোম্পানির পঁচিশটি ফিল্ম পান। এর তিন মাস পর প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রেস সেক্রেটারি আমিনুল হক বাদশা লুৎফর রহমানকে সচিবালয়ে ডেকে শুভেচ্ছাস্বরূপ নগদ তিন হাজার টাকা প্রদান করেন। টাকায় লুৎফর রহমানের তোলা ছবি মনোনীত হওয়ার ঘটনাকে তিনি জীবনের সেরা প্রাপ্তি মনে করতেন। এই বিশিষ্ট ফটোগ্রাফার ১৯৭৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ফটোগ্রাফি কম্পিটিশনে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে হতাশাগ্রস্ত মানুষ ও প্রকৃতির ওপর দুটি ছবি জমা দিয়ে ১ম ও ২য় পুরস্কার অর্জন করেন। লুৎফর রহমান কাজের স্বীকৃতি হিসেবে পেয়েছেন বিভিন্ন পর্যায়ে ১২টি সার্টিফিকেট ও পদক। স্বাধীন বাংলাদেশে তিনি টেনাসিস পুরস্কার পান। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখার জন্য আলোকচিত্রী লুৎফর রহমান ভারত সরকারের কাছ থেকে দুইটি সার্টিফিকেট লাভ করেন। ১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এলে স্মরণিকা প্রকাশের জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধের এবং বঙ্গবন্ধুর কিছু ছবির প্রয়োজন হয়। ফটোগ্রাফার লুৎফর রহমান বেশ কিছু ছবি প্রদান করেন এবং শেখ হাসিনার দেওয়া পুরোনো ছবিগুলো এডিট করে রি-প্রিন্ট করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রিয়ভাজন ও ব্যক্তিগত ফটোসাংবাদিক লুৎফর রহমান। খ্যাতিমান এই আলোকচিত্র শিল্পীর ক্যামেরায় তোলা বঙ্গবন্ধুর সব বিখ্যাত ছবি আমরা দেখতে পাই। ফটোগ্রাফার লুৎফর রহমান ২০০৬ সালের ১১ই অক্টোবর না ফেরার দেশে চলে যান। তাঁর একমাত্র ছেলে ফটোসাংবাদিক মোস্তাফিজুর রহমান মিন্টু বাংলাদেশ বেতারের আলোকচিত্র শিল্পী হিসেবে কর্মরত। তিনি বাবার স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে ফটোগ্রাফিতেই যুক্ত আছেন।

আপন চৌধুরী: চলচ্চিত্র গবেষক ও নির্মাতা

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ভাষার একনিষ্ঠ সাধক

ইফ্‌ফাত আরা দোলা

'গুরুদেবের নির্দিষ্ট কাজে চোখ দুটো উৎসর্গ করতে পেরেছি, এটাই পরম সান্ত্বনা'– অভিধান সংকলনের পর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে এমনটাই বলতে শোনা যেত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বাংলা শব্দ ও শব্দার্থ নিয়ে তাঁর বিশেষ আগ্রহের দিকটি প্রথমে ধরা পড়েছিল রবীন্দ্রনাথের চোখেই। হরিচরণ ছিলেন ঠাকুর পরিবারের পতিসরের জমিদারির সেরেস্তা। সেখানেই জমিদারির কাজকর্ম দেখভাল করতে এসে রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেন সংস্কৃতজ্ঞ হরিচরণকে। দিনের বেলায় সেরেস্তার কাজ সেরে সন্ধ্যার পর তিনি সংস্কৃত আলোচনা, বইয়ের পাণ্ডুলিপি দেখে প্রেসের কপি প্রস্তুত করা– এসব কাজে ব্যস্ত থাকতেন। জহুরির চোখ চিনে নিয়েছিল আসল রত্ন। এর কদিন পরেই শান্তিনিকেতনে ফিরে গিয়ে চিঠি লিখে পতিসর থেকে হরিচরণকে ডেকে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতার সাথে সাথে অর্পণ করেছিলেন বাংলা ভাষায় একটি অভিধান প্রণয়নের গুরু দায়িত্ব। সূচনা হয়েছিল বাংলা অভিধানের ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের। *বঙ্গীয় শব্দকোষ* নামের এই বিপুল শব্দভাণ্ডারের পেছনে হরিচরণ ব্যয় করেছিলেন তাঁর জীবনের চল্লিশটি বছর। নতুন শব্দ সংকলন ছাড়া আর কোনো দিকেই দৃষ্টি দেননি। হারিয়েছিলেন দৃষ্টিশক্তিও। *বঙ্গীয় শব্দকোষ* বাংলা ভাষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিধান হলেও এর পেছনের কাহিনি অনেকেরই অজানা।

হরিচরণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৬৭ সালের ২৩শে জুন উত্তর চব্বিশ পরগনার যশাইকাটিতে মায়ের পৈতৃক ভিটেতে। বাবা নিবারণচন্দ্র। মা জগৎমোহিনী দেবী। আর্থিকভাবে তিনি কখনোই সচ্ছল ছিলেন না। দারিদ্র্যের সাথে যুঝেই তিনি কাটিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর গোটা জীবন। প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেছিলেন জন্মস্থান যশাইকাটিতেই। এরপর কলকাতার জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন এবং বিদ্যাসাগরের প্রতিষ্ঠা করা মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে পড়াশোনা করেন। কিন্তু বিএ তৃতীয় বর্ষে উত্তীর্ণ হওয়ার পরই বাবার মৃত্যু ও আর্থিক অনটনে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে হয়। কলকাতা টাউন স্কুলে তিনি প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হন। কিন্তু পরিবারের প্রয়োজন মেটাতে তিনি বেশি মাইনেতে পতিসরের কাচারিতে সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাজ নেন। পতিসর তখন ঠাকুরবাড়ির জমিদারির অন্তর্গত। সেই সূত্রেই হরিচরণের সাথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচয়। একদিন জমিদারির কাজকর্ম দেখতে এসে রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেছিলেন হরিচরণ দিনে সেরেস্তার কাজ করলেও সন্ধ্যার পর থেকে ব্যস্ত থাকতেন সংস্কৃত আলোচনা, বইয়ের পাণ্ডুলিপি দেখে প্রেসের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা এসব কাজে। সেইসব পাণ্ডুলিপি নিরীক্ষণ করেই হরিচরণকে চিনতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কাজ সেরে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ফিরে গেলেও হরিচরণকে ভোলেননি। কিছুদিন পরই পতিসরের ম্যানেজার শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের কাছে তাঁর লেখা একটি চিঠি এল, তাতে লেখা ছিল– 'শৈলেশ, তোমার সংস্কৃতজ্ঞ কর্মচারীকে এইখানে পাঠাইয়া দাও'। চিঠি পেয়ে হরিচরণ পৌঁছলেন শান্তিনিকেতনে। সেখানে তিনি সংস্কৃত বিষয়ে শিক্ষকতার দায়িত্ব পেলেন। শান্তিনিকেতনে প্রায় তিন বছর শিক্ষকতার পর সংস্কৃত ভাষায় তাঁর অসামান্য দক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে *সংস্কৃত প্রবেশ* রচনার দায়িত্ব দেন। নিবিষ্ট চিত্তে *সংস্কৃত প্রবেশ* রচনার কাজ করে যাচ্ছিলেন এমন সময় (আনুমানিক ১৩১১ বঙ্গাব্দে) রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আরও একটি কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। রবীন্দ্রনাথ হরিচরণকে ডেকে বললেন, 'বাংলা ভাষায় তো তেমন কোনো অভিধান নেই। তোমাকে একটা অভিধান লিখতে হবে'। কবিগুরুর আদেশ পেয়ে তিনি প্রথমে *সংস্কৃত প্রবেশ* রচনার কাজ শেষ করেন। এরপর শুরু করেন অভিধান সংকলনের কাজ। গ্রন্থের সূচনালগ্নে সংকলক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোনো অভিজ্ঞ আভিধানিকের সাহায্য পাননি। কোনো পথপ্রদর্শক না থাকা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায়, কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে তিনি এই বিশাল শব্দকোষ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

গ্রন্থের ভূমিকায় হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই লিখেছেন:

> তখন অভিধান-রচনার অনুরূপ উপকরণ সঞ্চয়ের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলাম এবং অধ্যাপনার অবসানে নানা বাঙলা পুস্তক পাঠ করিয়া প্রয়োজনীয় বিষয় সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। আশ্রমের গ্রন্থাগারে যে সকল প্রাচীন বাঙলা গ্রন্থ ছিল, প্রথমে তাহা হইতেই অনেক শব্দ সংগৃহীত হইল। এই সময়ে প্রাচীন ও আধুনিক প্রায় পঞ্চাশখানি গদ্য-পদ্য গ্রন্থ দেখিয়াছিলাম। তদ্ভিন্ন সেই সময়ে প্রকাশিত বাঙলা ভাষার অভিধান, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা সমূহে প্রকাশিত প্রাদেশিক শব্দমালা ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃত শব্দসংগ্রহ হইতে অনেক শব্দ সঞ্চিত হইয়াছিল। প্রাকৃত ব্যাকরণ হইতেও অনেক বাঙলা শব্দের মূল সংস্কৃত শব্দ ও তদ্ভব শব্দও কিছু লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। ইহাতে আমার প্রায় দুই বৎসর অতীত হয়। ১৩১৪ সালের ১৬ চৈত্র আমার শব্দ-সংগ্রহের সমাপ্তির দিন।

এভাবে প্রথম দফায় শব্দ সংগ্রহের পর তিনি শুরু করলেন শব্দ সাজানোর কাজ। ১৩১৭ বঙ্গাব্দে গিয়ে সেই সাজানো শেষ হলো। এরপর চলল বাংলার সাথে প্রয়োজনীয় সংস্কৃত শব্দের সংযোজন, সেগুলোর ব্যুৎপত্তি, সত্যিকারের প্রয়োগ ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ইত্যাদিও লিপিবদ্ধ করার কাজ। হরিচরণের ভাষায় 'ইহাই প্রকৃত শব্দ-সংগ্রহের শুরু'। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কর্মনিষ্ঠা দেখে খুশি হয়ে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিপাঠীকে লেখেন, 'এ গ্রন্থখানি রচিত ও প্রকাশিত হইলে দেশের একটি মহৎ অভাব দূর হইবে'। কিন্তু কাজের এ পর্যায়ে ১৩১৮ বঙ্গাব্দে আর্থিক সমস্যার কারণে তাঁকে অভিধানের কাজ অসম্পূর্ণ রেখে শান্তিনিকেতন ছেড়ে কলকাতায় সেন্ট্রাল কলেজে সংস্কৃত পড়ানোর চাকরি নিতে হয়েছিল। তবে তাঁর মন পড়ে রয়েছিল ফেলে আসা অসমাপ্ত অভিধানের কাজে। এভাবে চলতে চলতে মনোকষ্ট সইতে না পেরে একদিন সব কথা খুলে বললেন রবীন্দ্রনাথকে। কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে হরিচরণকে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বৃত্তি মঞ্জুর করেন। বৃত্তি পেয়ে হরিচরণ ফিরে আসেন শান্তিনিকেতনে এবং অভাবনীয় পরিশ্রম করে ১১ই মাঘ ১৩৩০

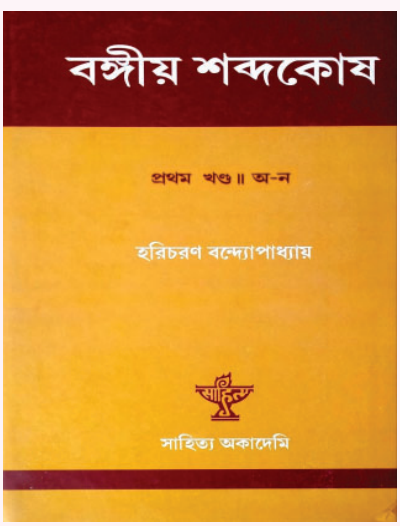

বঙ্গাব্দে অভিধান সংকলনের কাজ সম্পূর্ণ করেন। এ সময়ের মধ্যে হরিচরণ বাংলা শব্দ ও অর্থের খোঁজে যতরকম দেশি-বিদেশি ভাষার সংস্পর্শে বাংলা এসেছে, সব ছেনে ফেলেছেন। সংস্কৃতের সাথে আরবি, ইংরেজি, ফারসি, হিন্দি, পর্তুগিজ ইত্যাদি ভাষা খুঁজেও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ খুঁজে বের করে ক্রমানুসারে সেগুলোও লিপিবদ্ধ করেছেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখাতেও এ কথার সত্যতা মেলে। তিনি যখনই হরিচরণের বাড়ি যেতেন, তখনই দেখতেন তক্তপোষের উপর স্তূপ করে রাখা উর্দু, ফারসি, ইংরেজি, ওড়িয়া, মারাঠিসহ বিভিন্ন ভাষার অভিধান ছড়ানো রয়েছে। *বঙ্গীয় শব্দকোষ* নিয়ে হরিচরণের কাজের একাগ্রতা বোঝা যায় *আনন্দবাজার* পত্রিকায় প্রকাশিত সুরঞ্জন ঘোষের একটি লেখার এ বক্তব্যটি থেকে: "প্রতিদিন সান্ধ্য আহ্নিক সেরে লণ্ঠনের আলোয় কুয়োর ধারে খড়ের চালাঘরে পশ্চিম জানলার কাছে হরিবাবু কাজ করতেন। দ্বিজেন ঠাকুর তো ছড়াই বেধে ফেলেছিলেন, 'কোথা গো মেরে রয়েছ তলে/ হরিচরণ, কোন গরতে?/ বুঝেছি, শব্দ-অবধি-জলে/ মুঠাচ্ছ খুব অরথে'।"

রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছে ছিল এই অভিধানটি বিশ্বভারতী থেকেই প্রকাশিত হোক। তাই তিনি এর প্রকাশনার দায়িত্ব দিলেন বিধুশেখর শাস্ত্রী ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে। কিন্তু বিশ্বভারতীর কোষাগারে তখন যথেষ্ট অর্থ ছিল না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে যোগাযোগ করেও কোনো আশার আলো দেখা গেল না। প্রায় দশ বছর পড়ে রইল *বঙ্গীয় শব্দকোষের* পাণ্ডুলিপি। এ সময় হরিচরণ দ্বিতীয়বার শব্দসংগ্রহ ও সংযোজন করে অভিধানটি সংস্কার করেন। দীর্ঘ দশ বছর প্রকাশের অপেক্ষায় থাকা পাণ্ডুলিপিটি অবশেষে আলোর মুখ দেখে। 'বিশ্বকোষ'-এর নগেন্দ্রনাথ বসু অভিধানটি প্রকাশে সম্মত হলেন। জানালেন, কাগজের দামটা এখনই দিতে হবে, ছাপার খরচ পরে দিলেও চলবে। হরিচরণ তাতেই রাজি হলেন। সারা জীবনের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ ব্যয় করে ১৩৪০ সাল থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে তিনি এই অভিধানের ধারাবাহিক প্রকাশ আরম্ভ করেন। ১৩ বছর ধরে প্রকাশিত হয় মোট ১০৫টি খণ্ড। বিশ্বভারতী কোনো কমিশন ছাড়াই অভিধান বিক্রির ব্যবস্থা করে। হরিচরণের মৃত্যুর পর ১৯৬৬ ও ১৯৬৭ সালে দুখণ্ডে গোটা অভিধানটি প্রকাশ করে সাহিত্য একাডেমি।

একে একে তেরো বছর ধরে মোট একশ পাঁচটি খণ্ডে প্রকাশ পায় *বঙ্গীয় শব্দকোষ*। কাজের কিছু স্বীকৃতিও তিনি পেয়েছেন। ১৯৪৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক ও ১৯৫৪ সালে শিশিরকুমার স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছিলেন। ১৯৫৭ সালে আচার্য (Chancellor) জওহরলাল নেহেরুর হাত থেকে তিনি বিশ্বভারতীর সর্বোচ্চ স্বীকৃতি 'দেশিকোত্তম' গ্রহণ করেন। মহাত্মা গান্ধীও তাঁর কাজের কথা জানতে পেরে প্রশংসা করেছিলেন। গান্ধী তাঁর *হরিজন* পত্রিকায় হরিচরণকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গিলবার্ট মারের সঙ্গে তুলনা করেন।

যাঁর নির্দেশে হরিচরণ এই সুবৃহৎ কাজ সমাপ্ত করেছিলেন সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *বঙ্গীয় শব্দকোষ* প্রসঙ্গে লিখেছেন,

> শান্তিনিকেতন-শিক্ষাভবনের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সুদীর্ঘকাল বাঙলা অভিধান সঙ্কলন কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তাঁহার এই বহুবর্ষব্যাপী অক্লান্ত চিন্তা ও চেষ্টা আজ সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া সর্বসাধারণের নিকট উপস্থিত হইল। তাঁহার এই অধ্যবসায় যে সার্থক হইয়াছে, আমার বিশ্বাস সকলেই তাহার সমর্থন করিবেন। (শান্তিনিকেতন, ৮ই আশ্বিন ১৩৩৯)

রাজশেখর বসুও *বঙ্গীয় শব্দকোষ* সম্পর্কে লিখেছেন :

> কেহই শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ন্যায় বিরাট কোষগ্রন্থ সংকলনের প্রয়াস করেন নাই। *বঙ্গীয় শব্দকোষে* প্রাচীন ও আধুনিক সংস্কৃতের শব্দ (তদ্ভব, দেশজ, বৈদেশিক প্রভৃতি) প্রচুর আছে। কিন্তু সংকলয়িতার পক্ষপাত নাই, তিনি বাঙলা ভাষায় প্রচলিত ও প্রয়োগযোগ্য বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের সংগ্রহে ও বিবৃতিতে কিছুমাত্র কার্পণ্য করেন নাই। যেমন সংস্কৃত শব্দের ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন, তেমনি অসংস্কৃত শব্দের উৎপত্তি যথাসম্ভব দেখাইয়াছেন। এই সমদর্শিতার ফলে তাঁহার গ্রন্থ যেমন মুখ্যত বাঙলা সাহিত্যের প্রয়োজনসাধক হইয়াছে, তেমনি গৌণত সংস্কৃত সাহিত্য চর্চারও সহায়ক হইয়াছে। সংস্কৃত মৃত ভাষা কিন্তু গ্রিক লাটিনের তুল্য মৃত নয়। ভাগ্যবতী বঙ্গভাষা সংস্কৃত শব্দের অক্ষয় ভাণ্ডারের উত্তরাধিকারিণী, এবং এই বিপুল সম্পদ ভোগ করিবার সামর্থ্যও বঙ্গভাষার প্রকৃতিগত। আমাদের ভাষা যতই স্বাধীন স্বচ্ছন্দ হউক, খাঁটী বাঙলা শব্দের যতই বৈচিত্র্য ও ব্যঞ্জনা-শক্তি থাকুক, বাঙলা ভাষার লেখককে পদে পদে সংস্কৃত ভাষার শরণ লইতে হয়। কেবল নূতন শব্দের প্রয়োজনে নয়, সুপ্রচলিত শব্দের অর্থপ্রসার করিবার নিমিত্তও। অতএব বাঙলা অভিধানে যত বেশি সংস্কৃত শব্দের বিবৃতি পাওয়া যায় ততই বাঙলা সাহিত্যের উপকার। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই মহোপকার করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত শব্দের বাঙলা প্রয়োগ দেখিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, সংস্কৃত সাহিত্য হইতে রাশি রাশি প্রয়োগের দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়াছেন। এই বিশাল কোষগ্রন্থে যে শব্দসম্ভার ও অর্থবৈচিত্র্য রহিয়াছে তাহাতে কেবল বর্তমান বাঙলা সাহিত্যের চর্চা সুগম হইবে এমন নয়, ভবিষ্যৎ সাহিত্যও সমৃদ্ধিলাভ করিবে। (৩রা ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪)

বাংলা ভাষার একটি অভিধান সংকলনে জীবনের চল্লিশটি বছর ও সমস্ত সঞ্চয় নির্দ্বিধায় এবং আনন্দ চিত্তে ব্যয় করে গেছেন হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর সাধনার ফল *বঙ্গীয় শব্দকোষ*। একটি ভাষার অভিধান প্রণয়নের মতো আয়াসসাধ্য কাজ একক প্রচেষ্টায় সম্পাদন করতে গিয়ে এক সময় দৃষ্টিশক্তি চলে যায় তাঁর। হরিচরণের তা নিয়ে কোনো আক্ষেপ ছিল না। পরবর্তীকালে প্রণীত বাংলা অভিধানগুলো হরিচরণের *বঙ্গীয় শব্দকোষ*-এর কাছে গভীরভাবে ঋণী। আজকের ভাষা গবেষক, বাংলা শব্দানুসন্ধানী ও বাংলা ভাষাচর্চাকারী যে-কোনো ব্যক্তির কাছে *বঙ্গীয় শব্দকোষ*-এর আবেদন অনস্বীকার্য। তাই হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম আজও বাংলা অভিধান সংকলনের ইতিহাসে ভাস্বর। ১৯৫৯ সালের ১৩ই জানুয়ারি বাংলা ভাষার নিবেদিতপ্রাণ এই মহান সাধক মৃত্যুবরণ করেন।

তথ্যসূত্র

১. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও অঞ্জলি বসু (সম্পাদিত), *সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান*, প্রথম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, আগস্ট ২০১৬

২. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *আত্মপরিচয়*, রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ

৩. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় শব্দকোষ*, সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম খণ্ড, ১৯৬৬

৪. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় শব্দকোষ*, প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৩

ইফ্‌ফাত আরা দোলা: শিক্ষক, ইনজিনিয়ারিং ইউনিভারসিটি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা, প্রাবন্ধিক ও গবেষক

শুভ জন্মদিন প্রিয় হুমায়ূন আহমেদ

মঈনুল হক চৌধুরী

বিংশ শতাব্দীর বাঙালির জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে হুমায়ূন আহমেদ অন্যতম। তাঁকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তী শ্রেষ্ঠ লেখকদের মধ্যে অন্যতম হিসেবে অভিহিত করা হয়। তিনি একাধারে ঔপন্যাসিক, ছোটোগল্পকার, নাট্যকার, চলচ্চিত্রকার ও গীতিকার। বলা হয়ে থাকে, আধুনিক বাংলা কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের তিনি পথিকৃৎ। নাটক ও চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবেও তিনি সমাদৃত। হুমায়ূন আহমেদ ১৯৪৮ সালের ১৩ই নভেম্বর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত নেত্রকোণা মহকুমার মোহনগঞ্জে তাঁর মাতামহের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শহিদ ফয়জুর রহমান আহমদ এবং মা আয়েশা ফয়েজ। তাঁর পিতা একজন পুলিশ কর্মকর্তা ছিলেন এবং তিনি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তৎকালীন পিরোজপুর মহকুমার এসডিপিও (উপ-বিভাগীয় পুলিশ অফিসার) হিসেবে কর্তব্যরত অবস্থায় শহিদ হন। তাঁর বাবাও সাহিত্য অনুরাগী মানুষ ছিলেন। উল্লেখ্য, হুমায়ূন আহমেদ এমন একজন কথাসাহিত্যিক ছিলেন, যিনি এই প্রজন্মের অনেককেই বই পড়তে আগ্রহী করেছেন। বৃষ্টিতে ভিজতে শিখিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন প্রকৃতি কত আবেগ নিয়ে আমাদেরকে ভালোবাসে! মধ্যবিত্তের ছোটো ছোটো সুখ আর বড়ো বড়ো দুঃখকে তিনি আদর করে সাহিত্য বানিয়েছেন। আর সেসব আদরমাখা লেখা পড়ে এই প্রজন্মের অনেকের চোখে জল ঝরেছে, হয় হেসে নয়তো কেঁদে। তিনিই আমাদেরকে দেখিয়েছেন এই বাংলাদেশের পশুপাখি যুদ্ধাপরাধী রাজাকারদের 'তুই রাজাকার' বলে গালি দেয়, থুতু ছিটায়। বাকের ভাইয়ের মুক্তির দাবিতে তাঁর বাড়িতেই বোমা মারা হয়েছিল। দেয়ালে দেয়ালে চিকা মারা থেকে শুরু করে স্লোগান উঠেছিল ঢাকাসহ দেশের অনেক জায়গায়–'বাকের ভাইয়ের কিছু হলে, জ্বলবে আগুন ঘরে ঘরে'। বাঙালি মধ্যবিত্তের আবেগ নিয়ে প্রিয় এই লেখক খেলা করতে পারতেন। সমাজের বড়ো বড়ো অসংগতি খুব সূক্ষ্মভাবে কটাক্ষ করে ফুটিয়ে তুলেছিলেন তাঁর কথাসাহিত্যে। উল্লেখ্য, ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হুমায়ূন আহমেদের প্রথম উপন্যাস *নন্দিত নরকে* পাঠকমহলে এতটাই নন্দিত হয়েছিল যে এরপর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। ১৯৮০ থেকে ১৯৯০-এর দশকে বাংলাদেশ টেলিভিশনের জন্য ধারাবাহিক এবং স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র রচনা শুরু করেন তিনি।

১৯৮৩ সালে তাঁর প্রথম টিভি কাহিনিচিত্র 'প্রথম প্রহর' বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচার শুরু হলে বেশ জনপ্রিয়তা পায়। নব্বই দশকের মাঝামাঝি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করে লেখালেখিতে পুরো মনোযোগ দেন হুমায়ূন আহমেদ। তাঁর টেলিভিশন ধারাবাহিকগুলোর মধ্যে– 'এইসব দিনরাত্রি', 'বহুব্রীহি', 'কোথাও কেউ নেই', 'নক্ষত্রের রাত', 'অয়োময়', 'আজ রবিবার', 'নিমফুল', 'তারা তিনজন', 'মন্ত্রী মহোদয়ের আগমন, শুভেচ্ছা স্বাগতম', 'সবুজ সাথী', 'উড়ে যায় বকপক্ষী', 'এই মেঘ এই রৌদ্র' এখনও ইউটিউবে খুঁজে বেড়ান অনেকেই। এছাড়া হুমায়ূন আহমেদের চিত্রনাট্য ও পরিচালনার ছবিগুলোর মধ্যে *আগুনের পরশমণি*, *শ্রাবণ মেঘের দিন*, *দুই দুয়ারী*, *চন্দ্রকথা*, *শ্যামল ছায়া*, *নয় নম্বর বিপদ সংকেত*, *ঘেটুপুত্র কমলা* দর্শক ও সমালোচকদের মন জয় করেছে। 'খেলা', 'অচিন বৃক্ষ', 'খাদক', 'একি কাণ্ড', 'একদিন হঠাৎ', 'অন্যভূবন'-এর মতো নাটকগুলোর আলোচিত ডায়লগ এখনও অনেকের মুখেই শোনা যায়। বাংলা সাহিত্যে অবদানের জন্য ১৯৯৪ সালে একুশে পদক লাভ করেন তিনি। এছাড়া বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৮১), হুমায়ূন কাদির স্মৃতি পুরস্কার (১৯৯০), লেখক শিবির পুরস্কার (১৯৭৩), জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার (১৯৯৩ ও ১৯৯৪), বাচসাস পুরস্কারসহ (১৯৮৮) অসংখ্য সম্মাননা পেয়েছেন নন্দিত এই কথাসাহিত্যিক। ২০১২ সালের ১৯শে জুলাই মরণব্যাধি ক্যানসারের কাছে হার মানার আগে ঔপন্যাসিক, ছোটোগল্পকার, গীতিকার, নাট্যকার, চলচ্চিত্র পরিচালক– প্রতিটি ক্ষেত্রেই জনপ্রিয়তার শীর্ষে ছিলেন তিনি।

হুমায়ূন আহমেদ রসবোধ আর অলৌকিকতার মিশেলে বাংলা কথাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর সৃষ্টি হিমু, মিছির আলী, বাকের ভাই চরিত্রগুলো পেয়েছে অমরত্ব। তাঁর লেখা গানগুলো এখনও মানুষের মুখে মুখে। সাহিত্যের যে শাখাতেই তিনি হাত দিয়েছিলেন, তাতেই সোনা ফলিয়েছিলেন। ১৩ই নভেম্বর ঔপন্যাসিক, ছোটোগল্পকার, নাট্যকার, চলচ্চিত্রকার ও গীতিকার হুমায়ূন আহমেদের জন্মদিন। আমরা তাঁর জন্মদিনে তাঁকে জানাই আমাদের হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি।

মঈনুল হক চৌধুরী: কবি, প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক

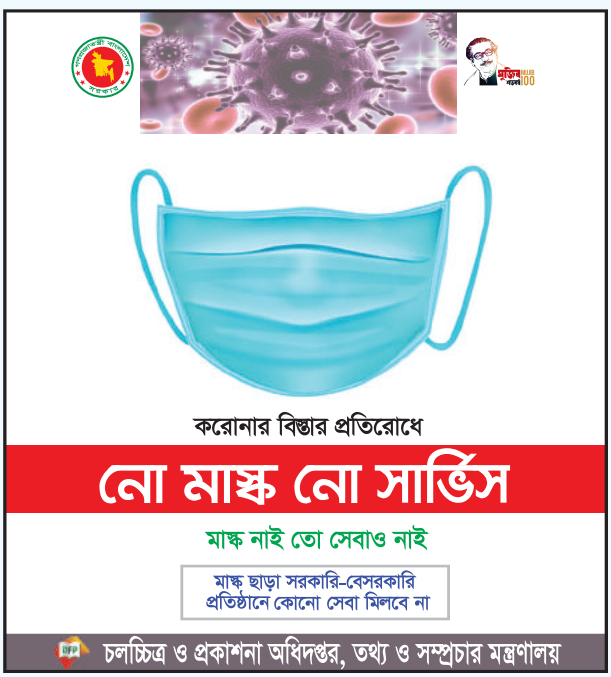

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন ও বর্তমান সরকার

শারমিন ইসলাম

বাংলাদেশ, বাঙালি ও বাংলা ভাষা ছিল বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের মূলভিত্তি। আমরা বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনকে এই তিনটি প্রশ্নের মাঝে খুঁজে পাই। বঙ্গবন্ধুর সামগ্রিক দর্শনের ভিত্তি ছিল– আপামর জনমানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা বিধান করা এবং দারিদ্র্য বিমোচনসহ সকল প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন। উন্নয়ন দর্শনে তাই তিনি প্রাধান্য দিয়েছিলেন সমবায়কে। স্বাধীনতার পর সমবায়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে সমবায়কে মালিকানার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। স্বাধীনতার পরপরই বাঙালি জাতির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায়ের গুরুত্ব অনুধাবন করে দেশের প্রত্যেক ইউনিয়নে ইউনিয়নভিত্তিক বহুমুখী সমবায় সমিতির মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষের কাছে সহজে এবং সুলভমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য এবং কৃষি উপকরণ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখতেন দেশের প্রতিটি গ্রামে সমবায় সমিতি গঠন করা হবে। গ্রামে গ্রামে গণমুখী সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে গ্রাম অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে চেয়েছিলেন তিনি। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন যে কত গভীরে প্রোথিত ছিল এবং সুদূরপ্রসারী চিন্তাসমৃদ্ধ তা লক্ষ করা যায় ১৯৭২ সালের ৩০শে জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে। তিনি বলেছিলেন, 'আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে–এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা, সমবায়ের পথ সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ। সমবায়ের মাধ্যমে গরিব কৃষকরা যৌথভাবে উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে।'

শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর সারা জীবনের সংগ্রাম আর আদর্শিক চেতনার আলোকে বিশ্বাস করতেন বাংলার মেহনতি জনগণ একদিন বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। ১৯৭২ সালে জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে দৃপ্তকণ্ঠে গভীর আবেগে তিনি বলেছিলেন, 'আমি বাঙালি জাতিকে ভিক্ষুকের জাতি হিসেবে দেখতে চাই না। আমি চাই তারা আত্মমর্যাদাশীল উন্নত জাতি হিসেবে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। এজন্য দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে সোনার বাংলা গড়তে হবে।' ইতিহাসের মহানায়কের এ কালজয়ী ভাষণ কোনো আবেগতাড়িত অভিব্যক্তি নয়; এটি তাঁর আজন্মলালিত এক গভীর মানবিক সংগ্রামী দর্শনও বটে। বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন, সমবায় একটি আন্দোলন ও চেতনার নাম, একটি আদর্শ ও সংগ্রামের নাম। ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত হলেও সমবায় সমিতি কোনো ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান নয়। সমিতিতে শেয়ার ক্রয় করে মুনাফা অর্জন করা সমবায়ীদের প্রধান লক্ষ্য নয়। সাতটি মৌলিক নীতিমালার ওপর নির্ভর করে সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। সেখানে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রণ, উন্মুক্ত সদস্য হওয়ার সুযোগ, শিক্ষা প্রশিক্ষণ, তথ্য বিনিময় এবং সমাজকে সম্পৃক্ত করে উন্নয়ন হচ্ছে প্রধান লক্ষ্য। বঙ্গবন্ধু সমবায়কে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করতেন।

সমবায় হলো গণতন্ত্রের পথ। সমবায়ের মাধ্যমে একদিকে যেমন গরিব কৃষকরা যৌথভাবে উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে, অন্যদিকে অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্পদের সুষম বণ্টন ব্যবস্থায় প্রতিটি ক্ষুদ্র চাষি গণতান্ত্রিক অংশ ও অধিকার পাবে। জোতদার ধনী চাষির শোষণ থেকে তারা মুক্তি লাভ করবে সমবায়ের সংহত শক্তির দ্বারা। একইভাবে কৃষক, শ্রমিক, তাঁতি, জেলে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যদি একজোট হয়ে পুঁজি এবং অন্যান্য উপাদানের মাধ্যমে একত্র করতে পারেন তবে আর মধ্যবর্তী ধনিক ব্যবসায়ী-শিল্পপতি গোষ্ঠী তাদের শ্রমের ফসলকে লুট করে খেতে পারবে না। সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামবাংলায় গড়ে উঠবে ক্ষুদ্রশিল্প, যার মালিক হবে সাধারণ কৃষক, শ্রমিক এবং ভূমিহীন নির্যাতিত দুঃখী মানুষ। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আজ সমবায় পদ্ধতিতে গ্রামে গ্রামে, থানায়, বন্দরে গড়ে তুলতে হবে মেহনতি মানুষের যৌথ মালিকানা। কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে পাবে ন্যায্যমূল্য, শ্রমিকরা পাবে শ্রমের ফলভোগের ন্যায্য অধিকার। কিন্তু এই লক্ষ্যে যদি আমাদের পৌঁছাতে হয় তবে অতীতের ঘুণে ধরা সমবায় ব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্তন করে একটি সত্যিকারের গণমুখী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। অতীতের সমবায় ছিল শোষকগোষ্ঠীর ক্রীড়নক। তাই সেখানে ছিল কোটারি স্বার্থের ব্যাপক ভূমিকা। আমাদের এই স্বাধীন বাংলাদেশে ওই ধরনের ভুয়া সমবায় কোনো মতেই সহ্য করা হবে না। আমাদের সমবায় আন্দোলন হবে সাধারণ মানুষের যৌথ আন্দোলন। কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি জনতার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। আপনারা জানেন আমি ঘোষণা

করেছি যে, সংস্থার পরিচালনা-দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ওপর, কোনো আমলা বা মনোনীত ব্যক্তির ওপরে নয়। আমার সমবায়ী ভাইয়েরা এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে অভিনন্দিত করেছেন। এই গণতন্ত্রীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই তাদের দায়িত্ব। তাদের দেখতে হবে যে সমবায় সংস্থাগুলো যেন সত্যিকারের জনগণের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে ওঠে। জেলে সমিতি, তাঁতি সমিতি, গ্রামীণ কৃষক সমিতি যেন সত্যিকারের জেলে, তাঁতি, কৃষকের সংস্থা হয়– মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী বা ধনী কৃষক যেন আবার এই সমিতিগুলোকে দখল করে অতীত দুর্নীতির পুনরাবৃত্তি না করে। যদি আবার সেই কোটারি স্বার্থ সমবায়ের পবিত্রতা নষ্ট করে, তবে নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন যে, আমরা পুরনো ব্যবস্থা বাতিল করে দেব। আমার প্রিয় কৃষক-মজুর-জেলে-তাঁতি ভাইদের সাহায্যে এমন একটি নতুন ও সুষম ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যা শোষণ ও প্রতিক্রিয়াশীল কোটারি স্বার্থকে চিরদিনের জন্য নস্যাৎ করে দেবে।' দেশের এবং জনগণের সার্বিক আর্থসামাজিক উন্নতির প্রতি বঙ্গবন্ধুর গভীর দায়বদ্ধতার কথা এখানে সুস্পষ্ট। দেশজ উন্নয়ন ছিল বঙ্গবন্ধুর একান্ত ভাবনা। কুটিরশিল্প ও ক্ষুদ্রশিল্পকে তিনি সমবায় ভিত্তিতে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু জানতেন শুধু উৎপাদন করলেই চলবে না, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যবস্থাও সুসংহত করতে হবে। প্রয়োজন রয়েছে সুষম বণ্টন ও সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রেও তিনি সমবায় ব্যবস্থাকে কাজে লাগানোর প্রয়াস নেন। ১লা মে ১৯৭২ সালে শ্রমিক দিবস উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত বেতার ভাষণে তিনি বলেন, 'সমবায়ের মাধ্যমে চার কোটি টাকা বিতরণ করা হবে। আমাদের সমগ্র পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অংশের মধ্যে রয়েছে বণ্টন ও সরবরাহ ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করা। ইতোমধ্যেই বেসরকারি ডিলার, এজেন্ট এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, যদি তারা অসাধু ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ না করে তাহলে তাদের সকল লাইসেন্স-পারমিট বাতিল করে দেওয়া হবে। আশু ব্যবস্থা হিসেবে সরকার প্রতি ইউনিয়নে ও সমস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানে সমবায় ভিত্তিতে ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এর ফলে বেসরকারি ব্যক্তিদের বণ্টনের ক্ষেত্রে একচেটিয়া কর্তৃত্বের অবসান ঘটবে এবং সরবরাহের ক্ষেত্রে সাময়িক স্বল্পতার সুযোগে যুক্তিহীন মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা রোধ হবে।'

বঙ্গবন্ধু সমবায়কে দেখতেন নতুন দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ার হাতিয়ার হিসেবে। তিনি দুর্নীতির কথা জানতেন, দুর্নীতিবাজদের কথা জানতেন, সমাজের পচনের কথা উপলব্ধি করতেন। এর থেকে মুক্তির জন্য তিনি সমবায় পদ্ধতিকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। তাইতো ১৯৭৫ সালের ২৬শে মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসভায় দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণাকালে বলেছিলেন, 'আমি আপনাদের সমর্থন চাই। আমি জানি আপনাদের সমর্থন আছে কিন্তু একটা কথা, এই যে নতুন সিস্টেমে যেতে চাচ্ছি আমি, গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে। ভুল করবেন না। আমি আপনাদের জমি নেব না। ভয় পাবেন না যে, জমি নিয়ে যাব, তা নয়। পাঁচ বছরের প্ল্যানে বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামে কো-অপারেটিভ হবে। প্রত্যেকটি গ্রামে গ্রামে এই কো-অপারেটিভ হবে। আমরা বাংলাদেশের মানুষ, আমাদের মাটি আছে, আমার সোনার বাংলা আছে, আমার পাট আছে, আমার গ্যাস আছে, আমার চা আছে, আমার ফরেস্ট আছে, আমার মাছ আছে, আমার লাইভস্টক আছে। যদি ডেভেলপ করতে পারি ইনশাআল্লাহ এদিন থাকবে না। আমার যুবক ভাইরা, আমি যে কো-অপারেটিভ করতে যাচ্ছি গ্রামে গ্রামে এর ওপর বাংলার মানুষের বাঁচা-মরা নির্ভর করবে।' এমনিভাবে বিভিন্ন সময়ে কৃষি সমবায়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে জাতির পিতা নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

বর্তমান সরকার ২০১৮ সালে যে জাতীয় কৃষিনীতি প্রণয়ন করেছে সেখানে কৃষি সমবায়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে ১৬ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে– কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আরও উল্লেখ করা হয় মৎস্য, দুগ্ধ ও সেবা খাতের মতো ফসল উপখাতেও সমবায় কার্যক্রম চালু করার সুযোগ রয়েছে। কৃষি সমবায়ের গুরুত্বারোপ করে নীতিমালায় বেশ কয়েকটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা নিম্নরূপ:

* ১৬.১: ভূমির মালিকানা অক্ষুণ্ন রেখে প্রান্তিক কৃষক, ক্ষুদ্র উৎপাদনকারী উদ্যোক্তাদের সমন্বয়ে স্বপ্রণোদিত সমবায়ভিত্তিক কৃষি উৎপাদনকে উৎসাহ এবং সহযোগিতা প্রদান;
* ১৬.২: সম্প্রসারণ সেবা গ্রহণ ও সমবায়ভিত্তিক উৎপাদন, কৃষিযন্ত্র ব্যবহার, বিশেষভাবে কৃষি উপকরণ সংগ্রহ, ঋণ এবং উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করা;
* ১৬.৩: লাভজনক ফসল উৎপাদন এবং সেচ ও খামার যান্ত্রিকীকরণ কর্মকাণ্ডে সমবায়ভিত্তিক উদ্যোগকে অগ্রাধিকার প্রদান করা;
* ১৬.৪: কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে সমবায়ভিত্তিক বিপণনকে সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান করা;
* ১৬.৫: কার্যকর পানি ব্যবস্থাপনা, সমবায় সমিতিগুলোকে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ ও প্রশিক্ষণ, আয়বর্ধন, সম্প্রসারণ সেবাপ্রাপ্তি, উপকরণ সংগ্রহ এবং ঋণপ্রাপ্তিতে সহযোগিতা প্রদান করা;
* ১৬.৬: সমবায়ভিত্তিক কৃষিপণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণনে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা;
* ১৬.৭: কোনো জমি পতিত বা অনাবাদি না রেখে অনিবাসী ও অনুপস্থিত জমির মালিকদের কৃষি উপযোগী জমি সমবায় ব্যবস্থায় চাষের আওতায় এনে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাজারজাতকরণে উদ্বুদ্ধ করা এবং সমবায়ের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য হতে অর্জিত লভ্যাংশ জমির মালিক, কৃষিশ্রমিক ও সমবায়ের মধ্যে যৌক্তিক হারে বিভাজনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থ সংরক্ষণ।

আমরা দেখতে পাই, কৃষকের স্বার্থ রক্ষার জন্য এবং উৎপাদন বৃদ্ধিতে বঙ্গবন্ধু কৃষি সমবায়ের ওপর যেভাবে গুরুত্বারোপ করেছেন, বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনাও একইভাবে গুরুত্বারোপ করেছেন। কৃষি ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিগত এক যুগে অভাবনীয় সাফল্য এসেছে, খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা এসেছে। বঙ্গবন্ধুর সময়ে সমবায় পদ্ধতিতে গ্রামে গ্রামে, থানায়, বন্দরে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয় মেহনতি মানুষের যৌথ মালিকানা। আর তাই তিনি ১৯৭৩ সালে মিল্ক ভিটার মতো সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনাকে পাথেয় করে ইতিবাচক মানসিকতায় ঋদ্ধ হয়ে প্রধানমন্ত্রীর বহুবিধ সমবায়বান্ধব কার্যক্রমকে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয়ে আসুন, আমরা সবাই মুজিবশতবর্ষে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে তুলি বঙ্গবন্ধুর কাঙ্ক্ষিত সোনার বাংলা। ৫০তম সমবায় দিবসে আসুন আমরা সেই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হই।

শারমিন ইসলাম: প্রাবন্ধিক

ডায়াবেটিস: প্রয়োজন সচেতনতা ও নিয়ন্ত্রণ

ডা. নাজনীন নাওয়াল (বিপাশা)

ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র হলো রক্তে গ্লুকোজ বৃদ্ধিপ্রাপ্তিজনিত একটি রোগ। এটি মূলত বিপাকজনিত সমস্যা, বংশগত বা পারিপার্শ্বিক কারণে ইনসুলিন নামক হরমোন নিঃসরণ কমে গেলে বা এই দুইয়ের মিলিত প্রভাবে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। এটি একটি নন কমিউনিকেবল (অসংক্রমণযোগ্য) রোগ– যা একবার হলে সম্পূর্ণ প্রতিকার করা সম্ভব নয়, কিন্তু নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। ডায়াবেটিস একটি নীরব ঘাতক। অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসের জটিলতা অনেক, তবে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকলে স্বাভাবিক জীবনযাপন করা যায়। সারা বিশ্বে বর্তমানে প্রাপ্তবয়স্ক ৪৬ কোটি ৩৩ লাখ লোক ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। অর্থাৎ ১০ জনের মধ্যে একজন আক্রান্ত এ রোগে। এভাবে চললে ৫১ শতাংশ হারে বাড়বে এ রোগ। ২০৪৫ সালের মধ্যে এতে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াবে ৭০ কোটি। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে ডায়াবেটিসের প্রবণতা ক্রমেই বাড়ছে। বিশ্বের মোট ডায়াবেটিস রোগীর ৩৫ শতাংশই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অধিবাসী। এসব মানুষের একটি বড়ো অংশ বাস করে শহরাঞ্চলে/উপ-শহরাঞ্চলে। কায়িক শ্রম কমে যাওয়া, জীবনযাত্রায় শহরায়নের প্রভাব, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, দুশ্চিন্তা বেড়ে যাওয়া, পারিবারিক ইতিহাস– সব মিলিয়ে ডায়াবেটিস হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়।

ডায়াবেটিসের প্রকারভেদ

ডায়াবেটিস প্রধানত তিন রকমের: টাইপ-১ ডায়াবেটিস, টাইপ-২ ডায়াবেটিস ও টাইপ-৩ গর্ভকালীন ডায়াবেটিস।

টাইপ-১ ডায়াবেটিস (Insulin dependent diabetes/Juvenile diabetes)

এ ধরনের ডায়াবেটিস বেশি দেখা যায় ক্ষীণকায় শিশু ও তরুণদের মধ্যে। এ রোগের লক্ষণ শৈশব থেকেই দেখা দিতে পারে এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটা আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে। বিশ্বের মোট জনগোষ্ঠীর ৫-১০ শতাংশ এ ধরনের ডায়াবেটিসে ভোগে। টাইপ-১ ডায়াবেটিসকে ডাক্তারি ভাষায় বলা হয় অটোইম্যুন রোগ। কোনো অজানা কারণে দেহের নিজস্ব প্রতিরোধ ব্যবস্থা আক্রান্ত হয় এবং তা কাজ করতে পারে না। ফলে অগ্ন্যাশয়ের বিটাকোষ যে ইনসুলিন তৈরি করে তা ধ্বংস হতে থাকে। তখন শরীর চাহিদা মতো ইনসুলিন তৈরি করতে পারে না। দেহ হতে থাকে ইনসুলিন শূন্য। এই অবস্থায় বাঁচার জন্য রোগীকে ইনসুলিন ইনজেকশন নিতে হয়। এই রোগের পেছনে জোরালো জিনগত কোনো কারণ নেই। এর জন্য পরিবেশগত কারণ বা ভাইরাসের সংক্রমণকে কেউ কেউ দায়ী করে থাকেন।

টাইপ-২ ডায়াবেটিস (Insulin non-dependent diabetes, Adult onset diabetes)

প্রয়োজনের তুলনায় কিছুটা কম ইনসুলিন নিঃসরণ হলে বা প্রতিবন্ধকতার কারণে ইনসুলিন ঠিকমতো কাজ করতে না পারলে হয় টাইপ-২ ডায়াবেটিস মেলাইটাস। বিশ্বে সবচেয়ে বেশি টাইপ-২ ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা (৯০ শতাংশ)। এ রোগে আক্রান্তদের শরীরে ইনসুলিন তৈরি হলেও শরীরের কোষগুলো সেই ইনসুলিন ঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে না। একে বলে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স। এর ফলে কালক্রমে ইনসুলিন ক্ষরণেও অসুবিধা হয়। রক্তে ইনসুলিনের মাত্রা কমে আসে। রেজিস্ট্যান্স ও ইনসুলিনের ঘাটতি মিলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা অনেক বেড়ে যায়।

টাইপ-৩ গর্ভকালীন ডায়াবেটিস (Gestational diabetes)

সন্তান গর্ভধারণ করার পর প্রথমবার ডায়াবেটিস শনাক্ত হলে তাকে গর্ভকালীন ডায়াবেটিস (GDM) বলে। এ ধরনের ডায়াবেটিসে উপসর্গের প্রকাশ ঘটে মৃদুভাবে, প্রসবের পর সমস্যা চলে যায়। তবে GDM গর্ভবতী মা ও শিশু দুজনের জন্যই বিপজ্জনক হতে পারে। প্রসবের সময় এবং প্রসব-পরবর্তী নানা জটিলতা দেখা দিতে পারে। শিশুর রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বৃদ্ধির ঝুঁকি আজীবন থাকতে পারে। যেসব নারীর GDM হয়, পরে তাদের ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

ডায়াবেটিসের লক্ষণ

ডায়াবেটিসের সাধারণ লক্ষণগুলো হলো– ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া (বিশেষ করে রাতের বেলায়), দুর্বলতা বোধ করা, ক্ষুধা বেড়ে যাওয়া, খুব তৃষ্ণা পাওয়া, কোনো কারণ ছাড়াই ওজন কমে যাওয়া, শরীরে কোথাও ক্ষত হলে সেটা শুকাতে দেরি হওয়া, দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যাওয়া এবং প্রদাহজনিত রোগে বার বার আক্রান্ত হওয়া।

ডায়াবেটিসের জটিলতা

রক্তে অতিরিক্ত গ্লুকোজ শরীরের অধিকাংশ কোষে কিছু বিশেষ ধরনের পরিবর্তন ঘটায়, যার জন্য এ কোষগুলো নিজেদের কাজকর্ম ঠিকমতো করতে পারে না। ফলস্বরূপ বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতিসাধিত হয়। ডায়াবেটিসের প্রধান প্রধান কিছু জটিলতা তুলে ধরা হলো:

- চোখের রোগ– দৃষ্টি ঝাপসা হওয়া (রেটিনোপ্যাথি, ক্যাটার‍্যাক্ট বা চোখের ছানি)
- কিডনির রোগ– কিডনির কার্যকারিতা কমে যাওয়া বা রেনাল ফেইলুর (নেফ্রোপ্যাথি)
- হৃদযন্ত্র ও রক্তনালীর রোগ– হার্টঅ্যাটাক, স্ট্রোক
- হাত পায়ের অনুভূতি কমে যাওয়া (ডায়াবেটিস নিউরোপ্যাথি)
- চামড়ায় ক্ষত সৃষ্টি, সংক্রমণ, পচনশীল ঘা/আলসার
- যকৃতের ক্ষতি– ফ্যাটি লিভার
- হাড়ের রোগ– হাড় ক্ষয় হওয়া (অস্ট্রিওপারোসিস)
- হাইপোগ্লাইসেমিয়া/কিটোএসিডোসিস।

ডায়াবেটিসের চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা

সকল ডায়াবেটিস রোগীর জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার মূলনীতি একই। সেগুলো হলো– খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন, পদ্ধতি মতো নিয়মিত কায়িক পরিশ্রম বা ব্যায়াম, ওষুধ গ্রহণ করা।

ডায়াবেটিক রোগীদের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে এবং সবচেয়ে জরুরিভাবে প্রয়োজন হলো সঠিক খাদ্যাভ্যাস বেছে নেওয়া। রক্তের গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণের জন্য মূলত শর্করা জাতীয় খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করার দরকার হলেও, অন্যান্য খাদ্যোপাদান গ্রহণের পরিমাণ ও হার কিছুটা পরিবর্তিত হতে হবে। ভাত, রুটি, আলু, মিষ্টি জাতীয় খাদ্য, মধু, শরবত, গ্লুকোজ, পায়েস ইত্যাদি জাতীয় খাদ্য খাওয়া অনেক কমাতে হবে। মসৃণ সাদা আটার রুটির পরিবর্তে খেতে হবে ভুসিওয়ালা আটার রুটি। তাজা ফলমূল, শাকসবজি বেশি করে খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে। নিয়মিত চীনাবাদাম বা কাজুবাদাম খাওয়া যেতে পারে। অন্যান্য স্বাস্থ্যকর খাবারের মধ্যে রয়েছে– ঘরে পাতা টক দই, কচি ডাবের পানি, বাদাম বা জলপাই তেল, ছোলা, সয়াপ্রোটিন, ওমেগা থ্রি তেল সমৃদ্ধ মাছ। আমাদের দেশীয় মৌসুমি

ফলগুলো খাওয়া যাবে, তবে টক ফল হলে আরও বেশি ভালো হয়। আমাদের খাদ্য গ্রহণের অভ্যাসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ডায়াবেটিক রোগীর জন্য প্রতিদিন তিনটি প্রধান খাদ্য ও ২/৩টি হালকা খাদ্যে (নাশতা) ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যায়ামের কোনো বিকল্প নেই। যাদের পক্ষে সুশৃঙ্খল ব্যায়াম করা সম্ভব নয়, তাদের জন্য উত্তম হলো হাঁটা। প্রতিদিন ৩০ মিনিট করে সপ্তাহে পাঁচ দিন শরীরচর্চা করা যেতে পারে। এতে শরীরে রক্ত চলাচল বাড়বে, মাংসপেশির জড়তা দূর হবে, ইনসুলিন ভালো কাজ করবে। রক্তে গ্লুকোজের মাত্রাও থাকবে নিয়ন্ত্রিত। রাতে ঘুম হবে ভালো। হৃৎপিণ্ড সুস্থ ও সবল হবে। কমবে রক্তচাপ। এখন করোনাকালে বারান্দায়, বাড়ির ছাদে/সামনের লনে হাঁটা যায়। সাইকেল চালানো বা জগিং করা যায়। এছাড়া সাঁতার কাটা, দড়ি লাফানো, অ্যারোবিকস, যোগব্যায়াম, মেডিটেশন ইত্যাদিও বেশ উপকারী।

খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন আর ব্যায়াম/শারীরিক শ্রম দিয়েও যদি কারো ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে না থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে ওষুধ ব্যবহার করতে হবে। ওষুধ দুই ধরনের– খাবার ওষুধ ও ইনসুলিন। ডায়াবেটিসের অনেক রোগীর ক্ষেত্রে মুখে খাবার ওষুধ রক্তের গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণে ভালো কাজ করে। মেটফরমিন, সালফোনাইল ইউরিয়া, নন সালফোনাইল ইউরিয়া, গ্লিমেপেরাইড ও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মুখে খাওয়ার ওষুধ। ডায়াবেটিসের চিকিৎসায় ইনসুলিন খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে আছে। ইনসুলিন ডায়াবেটিসের জটিলতা অনেক কমাতে পারে। ডায়াবেটিস নিউরোপ্যাথি, ডায়াবেটিস ডামোপ্যাথি, ডায়াবেটিস নেফ্রোপ্যাথি বা ডায়াবেটিস রেটিনোপ্যাথি নিয়ন্ত্রণ বা এসবের অগ্রগতি শ্লথ করতে ইনসুলিন ব্যবহারের বিকল্প নেই।

করোনায় আক্রান্ত ডায়াবেটিক রোগীদের করণীয়

- করোনা উপসর্গ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া।
- রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণে রাখা অর্থাৎ ৭ মিলিমোলের নিচে রাখা।
- তরল পানীয়, ফলের রস, স্যুপ, লেবু পানি ও ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করা।
- বাইরের ফাস্টফুড, প্রক্রিয়াজাত খাবার, কোমল পানীয়, আইসক্রিম পুরোপুরি বর্জন করা।
- ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা।
- করোনা উপসর্গ দেখা দিলে আতঙ্কিত না হওয়া, নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত নিজেকে আলাদা রাখা।
- অপরিষ্কার হাতে নাক মুখ স্পর্শ না করা, হাঁচি-কাশির সময় টিস্যু বা রুমাল ব্যবহার করা, একটু পর পর ২০ সেকেন্ড ধরে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া।
- ঘরের ভেতর/সামনের লনে হাঁটাচলা, ব্যায়াম করা।
- পর্যাপ্ত আলো বাতাস যুক্ত ঘরে থাকা।

বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস এবং বাংলাদেশ

ডায়াবেটিস রোগের লক্ষণ, চিকিৎসা, নিয়ন্ত্রণের কৌশল সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ১৯৯১ সালে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ও বিশ্ব ডায়াবেটিস ফেডারেশন (আইডিএফ) ১৪ই নভেম্বরকে ডায়াবেটিস দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। এদিনে বিজ্ঞানী ফ্রেডরিক বেনটিং জন্ম নিয়েছিলেন এবং তিনি বিজ্ঞানী চার্লস বেল্টের সঙ্গে একত্রে ইনসুলিন আবিষ্কার করেছিলেন। প্রতিবছর বিশ্বজুড়ে নানা আঙ্গিকে এ দিবসটি পালিত হয়।

বিশ্ব ডায়াবেটিস ফেডারেশনের (আইডিএফ) ২০১৫ সালে প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী, ডায়াবেটিসের কারণে বিশ্বে

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক ১১ই নভেম্বর ২০২১ দৈনিক সমকাল অফিসে বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস উপলক্ষে 'ডায়াবেটিস চিকিৎসা: বর্তমান ও আগামীর ভাবনা' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তৃতা করেন

প্রতি সেকেন্ডে একজন মৃত্যুবরণ করছে। ২০১৫ সালে প্রকাশিত উক্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে ৭১ লাখ লোক ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। আরও ৭১ লাখ লোক শনাক্তের বাইরে। সে হিসাবে ধারণা করা হচ্ছে সেই সময়ে বাংলাদেশে এক কোটি ৪২ লাখ লোক ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। দেশে বাড়ছে গর্ভকালীন ডায়াবেটিসের ঝুঁকিও। বাংলাদেশে গর্ভকালীন ডায়াবেটিসের হার অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি। দিন দিন বাড়ছে সব বয়সি ডায়াবেটিক লোকের সংখ্যা। বর্তমানে সারা বিশ্বে ডায়াবেটিক রোগীর সংখ্যা বিবেচনায় বাংলাদেশের অবস্থান দশমে। বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে ডায়াবেটিস মহামারি হয়ে উঠেছে। এখনই কার্যকরী উদ্যোগ না নিলে বিশ্বে ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা আগামী ২০৪০ সালের মধ্যে ৬৪ কোটি ছাড়িয়ে যাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বাংলাদেশে ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়। ১৯৮২ সালে বারডেম বহুমূত্র প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে কমিউনিটিভিত্তিক কর্মসূচি গঠনের লক্ষ্যে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগী কেন্দ্র হিসেবে দায়িত্ব লাভ করে। ইউরোপের বাইরে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান এটাই প্রথম।

বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস উপলক্ষে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও সরকার, বাংলাদেশ ডায়াবেটিস সমিতিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান শোভাযাত্রা, আলোচনাসভা, নানা ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করতে হলে এ রোগের ঝুঁকি ও প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে। সচেতনতা সৃষ্টির কাজটা শুরু করতে হবে পরিবার থেকেই। বাংলাদেশ ডায়াবেটিস সমিতি গর্ভকালীন ডায়াবেটিস প্রতিরোধে গর্ভধারণ-পূর্ব সেবা দিতে বিশেষ প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি মৃত্যুহার কমানো সহজ হবে।

ডায়াবেটিসের ব্যাপারে জনগণকে আরও সচেতন করার জন্য আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবসে এ বিষয়ক কর্মশালা, মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ, জনগণকে এ রোগ সম্পর্কে জানানো এবং সর্বোপরি সবার মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। সবাই সঠিক স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললেই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। তাই এ করোনাকালে সকল স্তরের মানুষকে জেনেবুঝে সচেতনভাবে ডায়াবেটিস প্রতিরোধের কর্মযজ্ঞে নিজের সামর্থ্য অনুসারে অংশগ্রহণ করতে হবে। তবেই আমরা সুস্থ ও সুন্দর জীবনযাপন করতে পারব।

ডা. নাজনীন নাওয়াল (বিপাশা): মেডিক্যাল অফিসার, পদ্মা জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা, bipashanazneen377@gmail.com

নিউমোনিয়ায় শিশুমৃত্যু রোধে সরকারের কার্যক্রম

ফারিয়া মরিয়ম

নিউমোনিয়া হলো উভয় বা একটি ফুসফুসে টিস্যু প্রদাহ। এটি একটি জটিল সংক্রমণ, যা প্রাথমিকভাবে ফুসফুসের বায়ুথলি আলভিওলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে দেশে এখনো বছরে প্রায় ২০ হাজার শিশুর মৃত্যু হয় বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। ১০ বছর আগে এ সংখ্যা আড়াই গুণ বেশি ছিল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক সমীক্ষা বলছে, বিশ্বজুড়ে প্রতি ২০ সেকেন্ডে পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুদের মধ্যে একজন করে নিউমোনিয়ায় প্রাণ হারায়। পাঁচ বা এর চেয়ে কম বয়সি শিশুদের মধ্যে নিউমোনিয়ার ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রাইমারি হেলথ কেয়ারের (পিএইচসি) সূত্রে জানা গেছে, দেশে শূন্য থেকে পাঁচ বছর বয়সি শিশুদের মধ্যে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে প্রায় ২২ শতাংশ শিশুর মৃত্যু হয়। তাদের মধ্যে শূন্য থেকে দুই বছর বয়সি শিশুর সংখ্যা ৯০ শতাংশ।

বিভিন্নভাবে নিউমোনিয়া ছড়াতে পারে। যেমন-

- শ্বাস নেওয়ার সময় বাচ্চার নাক বা গলার মধ্যে থাকা ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া ফুসফুসকে সংক্রমিত করতে পারে।
- হাঁচি-কাশির ফোঁটা থেকেও জীবাণু ছড়াতে পারে।
- বাচ্চার জন্মের সময় বা তার ঠিক পরে রক্তের মাধ্যমে ছড়াতে পারে।

পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুদের মধ্যে নিউমোনিয়ার যেসব লক্ষণগুলো দেখা যায়

- কাশি এবং শ্বাসকষ্ট, যা জ্বরসহ বা জ্বর ছাড়া হতে পারে।
- দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস বা নিম্ন বক্ষ প্রাচীরের ভেতরের দিকে ঢুকে যাওয়া।
- অসুস্থ বাচ্চাদের পান করতে বা খেতে অসুবিধা হয়।
- রোগী অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে, হাইপোথার্মিয়া এবং খিঁচুনি দেখা দিতে পারে।

যেভাবে নিউমোনিয়ার ঝুঁকি বাড়ে

- যেসব শিশু অপুষ্টি বা অসুস্থতায় (এইচআইভি, হাম) ভুগছে।
- পরিবেশগত কারণ।
- ঘরের অভ্যন্তরে বায়ুদূষণ (জ্বালানি হিসেবে কাঠ বা খড়কুটো ব্যবহার করার ফলে)।
- ঘরের মধ্যে অনেকে বসবাস করলে ধূমপান থেকে প্যাসিভ স্মোকিংয়ের কারণে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের টিকাদান কর্মসূচি সূত্রে জানা গেছে, ২০০৯ সালে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা ছিল প্রায় ৫০ হাজার। কয়েক বছর হিব-ভ্যাকসিন প্রয়োগের পর ২০১৫ সাল থেকে অধিক কার্যকর প্রতিষেধক নিউমোকক্কাস ভ্যাকসিন (পিভিসি) প্রয়োগ করা হচ্ছে। এতে নিউমোনিয়া সংক্রমণ অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। এই ভ্যাকসিন প্রয়োগের পর শিশুমৃত্যুর সংখ্যা ৩৭ শতাংশ থেকে ২২ শতাংশে নেমে এসেছে। চলতি বছর এ পর্যন্ত ৩৩ লাখ শিশুকে এ ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে শিশুমৃত্যুর হার ৪ শতাংশ। বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা হলো ২০২৫ সালের মধ্যে এ হার ৩ শতাংশে নামিয়ে আনা। দেশে পাঁচ বছরের কম বয়সি প্রতি এক হাজার জীবিত জন্ম নেওয়া শিশুর মধ্যে মৃত্যু হয় ৩০ জনের [সূত্র : ইউএনআইজি, ২০১৯]। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট হলো এই সংখ্যা ২৫-এ নামিয়ে আনা। প্রতিকারের ব্যবস্থা করলে এই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব।

স্বাস্থ্য খাতে সরকারের অনেক সাফল্য রয়েছে। নিউমোনিয়া রোধেও কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন করেছে। নিউমোনিয়া রোগের টিকার ব্যবস্থা রয়েছে। সব শিশুকে টিকা দেওয়া নিশ্চিত করতে পারলে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা কমে যাবে।

বিশ্বে প্রতিদিন প্রায় দুই হাজার শিশু নিউমোনিয়ায় মারা যায়। জন্ম নেওয়া প্রতি এক হাজার জীবিত শিশুর মধ্যে চারটি শিশু নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে। গ্লোবাল অ্যাকশন প্ল্যান ফর নিউমোনিয়া অ্যান্ড ডায়রিয়ার (জিএপিপিডি) লক্ষ্য হলো ২০২৫ সালের মধ্যে প্রতি এক হাজারে জীবিত জন্ম শিশুর মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা কমিয়ে আনা। কম খরচে নিউমোনিয়ায় প্রতিরোধ ও চিকিৎসা করা সম্ভব। ২০১৮ সালে নিউমোনিয়ায় পাঁচ বছরের কম বয়সি ১২ হাজার শিশু মারা গিয়েছিল। ২০০৯ সালে জিএপিপিডি চালু হয়। এর লক্ষ্য হলো সুরক্ষা, প্রতিরোধ ও চিকিৎসা সমন্বয়ের মাধ্যমে নিউমোনিয়া নিয়ন্ত্রণের গতি বাড়ানো। নিউমোনিয়া প্রতিরোধের জন্য সাবান দিয়ে হাত ধোয়া নিশ্চিতকরণ, সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং অভ্যন্তরীণ বায়ুদূষণ কমাতে

হবে। সুরক্ষার জন্য শিশু জন্মের পর ছয় মাস পর্যন্ত শুধু মায়ের বুকের দুধ খাওয়াতে হবে। ছয় মাস পর পর্যাপ্ত পরিপূরক খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে এবং ভিটামিন ও সাপ্লিমেন্ট খাওয়াতে হবে।

বর্তমান সরকারের স্বাস্থ্য খাতে সাফল্য হিসেবে ইপিআই কার্যক্রম (শিশুদের টিকা নিশ্চিত করার জন্য একটি কার্যক্রম) বিশ্বে একটি রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্য (এমএনসি এইচ অপারেশন প্ল্যান), ম্যাটারনাল, চাইল্ড, রিপ্রোডাকটিভ অ্যান্ড অ্যাডোলসেন্ট হেলথ (এমসিআরএএইচ) অপারেশন প্ল্যান ও জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান (এনএসএস অপারেশন প্ল্যান) এ তিনটি জায়গায় সরকার যথেষ্ট পরিমাণে জোর দিয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে শিশুমৃত্যুর হার কমানোর ক্ষেত্রে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং জেলা হাসপাতালকে পুরোপুরি সম্পৃক্ত করেছে বর্তমান সরকার। শুধু নিউমোনিয়ার চিকিৎসা করলেই নিউমোনিয়ায় আক্রান্তের হার কমিয়ে আনা যাবে না। এক্ষেত্রে তিনটি দিক রয়েছে। এগুলো হলো– প্রতিরোধ, সুরক্ষা ও চিকিৎসা। নিউমোনিয়াজনিত মৃত্যুর হার কমিয়ে আনতে এ তিনটি দিকেই সমানভাবে কাজ করছে সরকার। ১৯৯০ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে নিউমোনিয়াজনিত মৃত্যুর হার ৬৭ শতাংশ কমে এসেছে। এটি খুবই উৎসাহদায়ক। এক্ষেত্রে টিকাদান কার্যক্রমের অনেক বড়ো অবদান রয়েছে।

বাংলাদেশের টিকাদান কর্মসূচির আওতা ব্যাপক। নিউমোনিয়া ব্যবস্থাপনায় অক্সিজেন থেরাপি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আগামী পাঁচ বছরে ৫০০ ইউনিয়ন সেন্টার তৈরি হবে, যেখানে তিনটি রুম শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত থাকবে। এটি ইতোমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এজন্য মাঠ পর্যায়ের সেবাদাতাদের দক্ষতা বাড়াতে গত দেড় বছরে প্রায় চার হাজার ৫৩২ জনকে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সরকার এ সংক্রান্ত ওষুধও কিনে দিয়েছে। পাশাপাশি পর্যবেক্ষণের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এসব কাজ পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সমন্বয় করছে।

২০০৯ সালে নিউমোনিয়া কমিয়ে আনার জন্য বৈশ্বিক কৌশল এসেছে ডব্লিউএইচও এবং ইউনিসেফ থেকে। ২০১৯ সালে দুটো জরুরি বৈশ্বিক বৈঠক হয়েছে। এগুলোর একটি ছিল সর্বজনীন স্বাস্থ্য কাভারেজের বিষয়ে। আরেকটি ছিল যে দেশগুলোয় নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা বেশি, তাদের নিয়ে। এ বৈঠক থেকে একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে বার্সেলোনায় গ্লোবাল ফোরাম অব নিউমোনিয়া অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। বৈশ্বিকভাবে নিউমোনিয়া কীভাবে কমিয়ে আনা যায়, সে বিষয়ে সেখানে একটি কর্মপরিকল্পনা দেওয়া হয়।

ভাইরাস ও ফাঙ্গাসের কারণে নিউমোনিয়া হতে পারে। অর্ধেকের বেশি নিউমোনিয়া হয় ভাইরাসের কারণে। এক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিকের কোনো প্রয়োজন নেই। যেসব শিশুর শ্বাসকষ্ট হচ্ছে অথবা দ্রুত শ্বাস নিচ্ছে, তাদের অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন (ডব্লিউএইচও) এ বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিয়েছে। ২০১৩ সালে এ বিষয়ে নতুন দিক নির্দেশনা এসেছে। এসব নির্দেশনা অনুসরণ করে স্বাস্থ্যসেবা।

১৯৯০ সালে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন (ডব্লিউএইচও) কিছু ঝুঁকির কারণ চিহ্নিত করেছে। এক্ষেত্রে প্রথমেই টিকা সহজলভ্য করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া অভ্যন্তরীণ বায়ুদূষণ ও অপুষ্টি ঝুঁকির কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন আমাদের যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে। বাংলাদেশ সরকারও নিউমোনিয়া রোধে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়া টিকাদান নিশ্চিতকরণ, অপুষ্টি রোধ ও অভ্যন্তরীণ বায়ুদূষণ কীভাবে কমানো যায়, সে বিষয়ে সরকারের পাশাপাশি সকলকে সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে। পাশাপাশি মা ও পরিবারের সবার স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। এতে করে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস পাবে।

ফারিহা মরিয়ম: প্রাবন্ধিক

অ্যাসোসিও লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড

অ্যাসোসিও লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড ২০২১ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন ডিজিটাল বাংলাদেশের স্থপতি প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়। দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও অবদানের জন্য সজীব ওয়াজেদ জয়কে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। আইসিটি উপদেষ্টার পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। এর আগে ১৯৯৭ সালে এ পুরস্কারে ভূষিত হন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির মোহাম্মদ, ২০০৪ সালে থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনাওয়াত্রা এবং ২০১০ সালে বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

ঢাকায় অনুষ্ঠিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের বিশ্ব সম্মেলন 'ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অন ইনফরমেশন টেকনোলজি ২০২১ (ডব্লিউসিআইটি ২০২১)'-এর দ্বিতীয় দিনে ১২ই নভেম্বর এশিয়া-ওশেনিয়া অঞ্চলের ২৪টি দেশের সংস্থা এশিয়ান-ওশেনিয়ান কম্পিউটিং ইন্ডাস্ট্রি অর্গানাইজেশন (অ্যাসোসিও) সজীব ওয়াজেদ জয়কে এ পুরস্কারে ভূষিত করে। অ্যাসোসিও-এর বর্তমান চেয়ারম্যান ডেবিডের পক্ষে ইমিডিয়েট চেয়ারম্যান সারাকনন্দা পুরস্কারটি হস্তান্তর করেন। এর আগে সম্মেলনে 'অ্যাসোসিও অ্যাওয়ার্ড নাইট' শীর্ষক অনুষ্ঠানে অ্যাসোসিও'র সাবেক চেয়ারম্যান আবদুল্লাহ এইচ কাফি এ পুরস্কার ঘোষণা করেন। আন্তর্জাতিক এ সংস্থাটি তথ্যপ্রযুক্তি খাতে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এ পুরস্কার দিয়ে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে তথ্যপ্রযুক্তিতে সাফল্য অর্জন করায় বিভিন্ন দেশের সরকারি- বেসরকারি সংস্থা ও উদ্যোক্তাকে পুরস্কৃত করে সংস্থাটি।

প্রতিবেদন: জে আর পঙ্কজ

গ্রামের লক্ষ্মী সুমিতা

মোহাম্মদ নজরুল হাসান ছোটন

মা কলসি ভরে এনে ঘরে রেখে মেয়ে সুমিতাকে বলে, এই অকালকুষ্মাণ্ড তাড়াতাড়ি ভাত খাইয়া আমারে উদ্ধার কর!

মায়ের কথায় সুমিতা নীরবে চোখের পানি ফেলে। ভাত খেয়ে দোকানে যায়।

মা প্রায়ই মেয়েকে এভাবে কটূক্তি করে। যে মেয়েকে এক সময় মা আদর করে সিনেমার নায়িকার নামে নাম রেখেছিল 'সুমিতা', আজ সে মেয়েই হলো অকালকুষ্মাণ্ড! মায়ের-ই বা দোষ কী? অভাবের সংসার। তার ওপর যেখানে মেয়ের পানি আনার কথা সেখানে বৃদ্ধ মায়ের পানি আনতে হয়। মেয়ে পঙ্গু! তাই পঙ্গু মেয়েকে নিয়ে চিন্তা করে মা নানাভাবে বকাঝকা করে।

আগে সুমিতাদের অবস্থা এরূপ কষ্টকর ছিল না। সুমিতার বাবার ছিল একটি চায়ের দোকান। খুব নাম ছিল সেই দোকানের। দোকানের আয় দিয়েই তাদের সংসার মোটামুটি ভালোভাবেই চলত।

সুমিতার ছিল দুই ভাই অমল ও কমল। ছোটোবেলায় সুমিতার বাঁ পায়ে পোলিও রোগ হয়। গরিব বাবা চেষ্টা করেছে মেয়ের পোলিও রোগ সারাতে। কিন্তু পারেনি। আট বছর বয়সেই সুমিতার একটি পা বিকল হয়ে যায়।

সুমিতার বাবা রঞ্জন শীল শীলের কাজ না করে চায়ের দোকান দিয়েছিল বেশি আয়ের জন্য। কিন্তু কপাল মন্দ! সুমিতার বয়স যখন বারো আর ছোটো দুই ভাইয়ের বয়স ছয় ও চার, তখন তাদের বাবা কালাজ্বর হয়ে মারা যায়। তারপর তাদের পরিবারে অভাব-অনটনের পরিমাণ বেড়ে যায়।

সুমিতা পঙ্গু হয়েও বাবার দোকানটি চালু রাখে। কিন্তু এখন সেই দোকানে তেমন একটা লোক আসে না। নিজে পঙ্গু হয়ে যাওয়ায়

এবং অল্প বয়সে বাবা মারা যাওয়ায় এই গ্রামের লোক সুমিতাকে ভালো চোখে দেখত না।

তারা বলে, ওর দোকানের চা খাইলে আমাদের কোনো ক্ষতি হতে পারে।

নিজে পঙ্গু হয়ে যাওয়াটা আর বাবা মারা যাওয়াটা যেন তার অপরাধ। তার নিজের দোষেই যেন এমনটি হয়েছে। তবুও গ্রামের বাইরের লোক মাঝে মাঝে চা খেতে আসে। কিন্তু তেমন একটা বিক্রি হয় না।

সুমিতার ইচ্ছে তার দুই ভাইকে পড়াবে। কিন্তু অভাবের সংসারে খাওয়াই জোটে না। পড়াবে কীভাবে?

একদিন সুমিতাদের চায়ের দোকানে এক এনজিও'র লোক চা খেতে আসে। তার কাছ থেকে সুমিতা জানতে পারে সরকারের উদ্যোগে Skills for Employment Investment Program (SEIP)-এর আওতায় বিভিন্ন সরকারি অফিস ও এনজিও মানব দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। এনজিও'র লোকটির সঙ্গে ছিল কিছু মাছের পোনা। তা দেখে সুমিতা সে লোকটিকে জিজ্ঞাসা করে– আপনার সঙ্গে ওটা কী?

এনজিও'র লোকটি বলে, মাছের পোনা।

ওগুলো কী করবেন?

এক লোক তার পুকুরে মাছের চাষ করবে বলে আমাদের কাছে মাছের পোনা চেয়েছিল। তার কাছে নিয়ে যাচ্ছি।

সুমিতার তখন মনে পড়ল, আমাদের বাড়ির পেছনেও তো একটি মজা পুকুর আছে। বড়ো কাকা সে পুকুরটি নিজের বলে দাবি করেছিল। ছোটো কাকা ঝগড়া করে তার থেকে পুকুরটি আমাদের নামে লিখে দেয়। সুমিতা ভাবে, আমি যদি আমাদের পুকুরটায় মাছ চাষ করি, কেমন হবে। সে তখন এনজিও'র লোকটিকে বলে, আমি কি আমাদের পুকুরে মাছ চাষ করতে পারব?

অবশ্যই পারবে। তবে এর আগে কিছু ট্রেনিং নিতে হবে। যেমন– কীভাবে মাছের পোনা পুকুরে ছাড়তে হয়, কীভাবে মাছের খাবার দিতে হয়, কীভাবে পুকুর পরিষ্কার রাখতে হয়, কত মাস পর ওরা ডিম ছাড়ে, কত মাসে বড়ো হয়– এসব সম্পর্কে জানতে হবে।

আমি আপনাদের কাছে মাছ চাষের ট্রেনিং নিতে চাই।

সে তো ভালো কথা! আমি তোমাকে ঠিকানা দিচ্ছি। এইখানে আমাদের ট্রেনিং সেন্টার। সেখানে যেও।

এনজিও'র লোকটি সুমিতাকে একটি ঠিকানা লেখা কার্ড দেয়।

পরদিন সুমিতা মাকে এনজিও অফিসে যেতে চাওয়ার কথা বলে।

মা বলে, যদি ভালো থাকতি, তাইলে তো সবই পারতি। এই ভাঙা ঠ্যাং নিয়া কোথায় যাবি?

সুমিতা বলে, মনের জোর বড়ো জোর মা। মনে বল থাকলে সবই পারা যায়। তুমি আমারে বাধা দিও না মা। সেখান থেকে আমি মাছ চাষের ট্রেনিং নিব।

তারপর সুমিতা এনজিও অফিসে যায় মাছ চাষের ট্রেনিং নেওয়ার জন্য। সেখানে মাস খানিক ট্রেনিং নেয়।

তারপর সেই এনজিও'র অফিস থেকে মাছের পোনা ও টাকা ধার নিয়ে তাদের মজা পুকুরেই মাছ চাষ শুরু করে। ছোটো দুই ভাই অমল-কমলও বোনকে সাহায্য করে। সুমিতা প্রতিদিন বিকেলে বাড়ি এসে মাছের খাবার দেয়। অমল-কমল পুকুর পাহারা দেয়। মাছের খাবার কিনে আনে। পুকুর পরিষ্কার করে।

এভাবে ছয় মাস পর পুকুরের মাছ বড়ো হয়। সুমিতা জেলেদের খবর দেয় মাছ ধরার জন্য। তারা জাল ফেলে অনেক বড়ো বড়ো মাছ ধরে। সুমিতা জেলেদের কাছে বেশ লাভে ১০,০০০ টাকার মাছ বিক্রি করে। এত টাকা একসঙ্গে সে কখনো দেখেনি! অভাবের সংসারে এত টাকা পাবে কোথায়? তাই সে বার বার টাকাগুলো গুনে দেখে। আজ সে খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায়! মাকে জড়িয়ে ধরে বলে, মা তোমার অভাবের সংসারে আমি সুখশান্তি ফিরিয়ে আনবোই!

পরদিন সুমিতা এনজিও অফিসে গিয়ে ধারের টাকা শোধ করে। বাকি টাকা দিয়ে মাছের পোনা কিনে আবার পুকুরে ছাড়ে। এবারও বেশ লাভে মাছ বিক্রি করে ১৫,০০০ টাকা পায়। সেই টাকা থেকে সুমিতা মাছের পোনা ও অন্যান্য জিনিস কিনে। বাকি টাকা ব্যাংকে নিয়ে জমা করে।

এভাবে কয়েক বছরের মধ্যেই সুমিতাদের পরিবারের অভাব-অনটন প্রায় চলে যায়। সুমিতা এখন স্বাবলম্বী। সে তার দুই ভাইকে স্কুলে ভর্তি করায়। বলে, যেমন করে হোক আমার দুই ভাইকে আমি পড়াবোই। পড়াশোনা করে ওরা বড়ো হবে। এই আমার ইচ্ছা।

সুমিতা গ্রামের মেয়েদের উৎসাহ দেয় মাছ চাষ করতে, মুরগি পালন করতে, সেলাইয়ের কাজ করতে। তার উৎসাহে গ্রামের মেয়েদের চোখ-কান খুলে যায়। সেই গ্রামের মেয়ে রহিমা, করিমন, শেফালী, সাবিত্রী, মনি ওরা গিয়ে এনজিও অফিসে ট্রেনিং নেয় মাছ চাষের, মুরগি পালনের, সেলাইয়ের। এভাবে গ্রামের বেশির ভাগ মেয়েরাই সুমিতার উৎসাহে এনজিও অফিস থেকে ট্রেনিং নিয়ে নিজেরা মাছ চাষ করে, মুরগি পালন করে, সেলাইয়ের কাজ করে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে।

সুমিতার এখন ইচ্ছে, সে সেলাইয়ের কাজ করবে। কিন্তু বাবার দোকানটি চালাবে কে? চায়ের দোকান চালিয়ে, মাছ চাষ করে সেলাই করার সময় পাবে না। তাই সে বলে, যে তাকে বিয়ে করবে সে দোকানটি চালাবে।

এক সময় যে মেয়েকে বলা হতো অকালকুষ্মাণ্ড, আজ সে মেয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ সমস্ত গ্রাম! পঙ্গু বলে তার যে বদনাম ছিল, তাকে বিয়ে করা যাবে না, আজ স্বাবলম্বী হওয়ায় সে বদনাম ঘুচে গেছে। আজ অনেকেই তাকে বিয়ে করতে চায়। তবুও সে ভালো চরিত্রবান লোক খুঁজে। যাকে বিয়ে করে সে সুখী হতে পারবে।

তারপর এক সময় এক ভালো চরিত্রবান লোকের সন্ধান পেয়ে সুমিতা তাকে বিয়ে করে। সে লোক চায়ের দোকানের পরিবর্তে সেখানে রুটির বেকারি দিতে চায়। সুমিতা তাতে রাজি হয়। তারপর সে সেলাইয়ের ট্রেনিং নিয়ে সেলাইয়ের কাজ শুরু করে।

সুমিতা এখন মাছের চাষ করে আর সেলাইয়ের কাজ করে। স্বামী রুটির বেকারি চালায় আর তাকে মাছ চাষে সাহায্য করে। সে এখন গ্রামের মধ্যে একজন অন্যতম সুখী মানুষ।

গ্রামের মানুষ এখন তাকে ডাকে 'গৃহের লক্ষ্মী' বলে। তার জন্যই তাদের পরিবারের অভাব-অনটন আজ দূর হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, তার উৎসাহেই গ্রামের মেয়েরা এনজিও অফিস থেকে ট্রেনিং নিয়ে মাছ চাষ করে, মুরগি পালন করে, সেলাইয়ের কাজ করে আজ স্বাবলম্বী হয়েছে। তাই লোকেরা আজ তাকে বলে 'গ্রামের লক্ষ্মী সুমিতা'!

জাতির জনক

তাহমিনা কোরাইশী

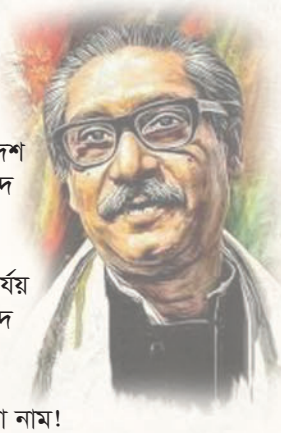

সেই দিন বত্রিশ নম্বর বাড়িটি ছিল একটি বাংলাদেশ
বীভৎস করালী ঘায়ে রক্ত রক্ত রক্তাক্ত সেই জনপদ
লালসূর্য সবুজ প্রান্তর ক্ষণকাল শ্লথ চরাচর
ওড়েনি পাখিরা শব্দেরাও হঠাৎ মুহ্যমান
নরঘাতকের তাণ্ডবলীলায় ঘটেছিল মানবতার বিপর্যয়
স্বাধীনতা শব্দটি নরপশুর থাবায় করেছিল আর্তনাদ
এই সেই মাটি যেখানে লুটিয়ে পড়েছিল লালসূর্য
বাঁক বদলের পালায় নিরন্তর হেঁটে চলা সেই ধাম
এত সহজেই মুছে ফেলা যায় কি খেরখাতায় লিখা নাম!
সেদিনের সেই দাম্ভিক উচ্চারিত শব্দগুলো
আজ বুমেরাং হয়ে বিঁধেছে শত্রুর বুকে
ঘটেছে পিতৃহননের শাপমুক্তির মহা-উৎসব।
তোমার আত্মজা রক্ত শপথের এক মূর্ত প্রতীক
তোমার দীক্ষা বীজমন্ত্রে আজ সে
জানে বাংলার প্রতিটি ঘর প্রতিটি প্রান্তর
মহাশক্তিতে রণক্ষেত্রটি আমাদের দখলে
ইতিহাস আপন বলয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়।
জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান তুমি, তুমি বাংলার বন্ধু বঙ্গবন্ধু
দিয়েছিলে মুঠো মুঠো ভালোবাসায় বিজয়ের স্লোগান
প্রদীপ্ত লালসূর্য ফসলের সবুজ প্রান্তর লোকালয়জুড়ে
ছড়িয়ে আছো তুমি আমাদের অস্তিত্বের অবয়বে।

সোনার বাংলাদেশ

সাইফুল ইসলাম জুয়েল

নতুন ভোরে নতুন আলোয়
নতুন দিনের হাসি
কোথায় পাবে এমন এদেশ
স্বপ্ন রাশি রাশি।
কোথায় পাবে এমনটা যার
হাওয়ায় সুমধুর,
মেঘের মাঝে, যায় যে ভেসে
স্বপ্নমাখা সুর।
আকাশ ছুঁতে হাতছানি দেয়
বৃক্ষ সারি সারি
শ্যামল গাঁয়ের মেঠোপথ
বানায় স্বপ্নচারী।
আমার সোনার বাংলাদেশের
রূপে আঁচলভরা,
এমন দেশের জন্য আমি
ধন্য বসুন্ধরা।

উদার আকাশ

আমিরুল হক

আকাশ যতটা বড়ো
ততটাই উদার
তার সীমা-পরিসীমা কতটা জানি না।
শুধু এটুকুই জানি
এর কোনো শেষ নেই।
তবে আকাশের রং নীল।
নীল তো ভালোবাসার রং।
এই রং দেখে
মনে মেখে হয়ে যায় একাকার।
আকাশকে সাক্ষী রেখে মানুষ
ভালোবাসার কথা বলে
কল্পনায় ছবি আঁকে
বাহারি স্বপ্ন দেখে
মনের আনন্দে উদ্ভাসিত হয়।
আবার আবেগ আপ্লুত চিত্তে কাব্য কথামালার সম্ভারে
ভরে তোলে হৃদয়ের আঙিনা।
আকাশ উদার বলেই
লক্ষ কোটি তারা আর চন্দ্র সূর্য
গ্রহ নক্ষত্ররাজিকে
তার বিশাল বক্ষে আগলে রেখে দীপ্তি ছড়ায়।
চোখের পাতায় ভেসে ওঠে
নয়নাভিরাম আলোর মেলা।
ডানা মেলে উড়ে যাবে
পাখিদের ঝাঁক।
নির্মল আকাশ কার না ভালো লাগে?
আকাশ না থাকলে এমনটা লাগতো না।
আকাশ আছে বলেই প্রকৃতি সমৃদ্ধ
তার প্রাচুর্যভরা সৌন্দর্যের মাঝে
আমরা হারিয়ে যাই।
ভালোলাগার আনন্দে মনের সংকীর্ণতা
মুছে ফেলে তার উদারতার কাছে
মানি হার।

শোধ হবে না তাঁদের ঋণ

আবু তৈয়ব মুছা

নীলাকাশে পায়রা উড়ে
আরও বেলুন উড়ে,
রক্তে কেনা বিজয় এলো
ষোলোই ডিসেম্বরে ॥
লাল-সবুজের ঐ পতাকাই
বিজয় কেতন ছবি,
যে ছবিটার স্বপ্ন বুনেই
মুজিব, এই বিজয়ের কবি।
পায়রা উড়াও, খুশি ছড়াও
তবু নয়তো খুশির দিন,
যাঁরা দিলো বিজয় এনে
তাঁদের শোধ হবে না ঋণ।

মনের আকাশে ঝুম বৃষ্টি

রুহুল গনি জ্যোতি

মনের আকাশে ঝুম বৃষ্টি
এই নিয়ে আছি বেশ
আধো জাগরণে জড়িয়ে রয়েছে
সেই স্বপ্নের রেশ
কিছু না কিছু না– হালকা চটুল
তবু মনে দেয় দোলা
দমকা হাওয়ায় কড়া নেড়ে যায়
হৃদয় রয়েছে খোলা
সেখানে কেবলই ধু ধু প্রান্তর
উদ্দাম হাওয়া নাচে
দুঃসাহসী কিশোরী দিনের
ঘুঙুরটা পড়ে আছে
তবু বাঁশি বাজে তবু ওঠে সুর
তবুও বৃন্দাবন
পাওয়া না-পাওয়ার দোলাচলে দোলে
রঙে রসে ভরা মন।

শৈশবের গ্রাম

জব্বার আল নাঈম

ধানমাড়াইয়ের ধান আর মাহফিলের টংদোকান
জমা-খরচের আইসক্রিম ঘরপালানো সন্ধ্যা
এসব মুছে দিয়েছে আধুনিক শহর;
জোড়পুল বাজার
বাবুলের বাঁশিসুর
সিঙ্গাড়া হাশিম
খালেকের খইকলা
অলুর অদ্ভুত সাইকেল
ডেউয়া জোড়পুল।
রুস্তম কাকার হাস্কি আজান। দারিন্দা-কাশিমপুর।
প্রেমনগর স্কুল। ক্রিকেট ইতিহাস। হাঙরবোট।
মমিন মামার তালকোন্দা। মোল্লার মুড়িমোয়া।
ডুবুরি আকলিমার বাড়িফেরার উপাখ্যান।
বনমালির প্রেম। গালভরতি পান। লাল ঠোঁটের সরল হাসি।
বড়োবোন পারভীন।
হারাতে চাই না প্রতিমা
পাটখড়ি
সমুদ্রজল
মায়ের মায়াবী মখমল
আমার প্রিয় বাংলাদেশ।

আমার বাংলাদেশ

নিজামউদ্দীন মুন্সী

হিন্দু মুসলিম নরনারী
এক নদীতেই গোসল সারি
এক রাস্তাতেই চলাফেরা
কেউ নয় ঘৃণ্য কেউ নয় সেরা।
ফুল চাষ করে সে কোন্ জনা
কিনতে গিয়ে কেউ জিগায় না
এক জেলের মাছ সবাই কেনে
তার কী-বা জাত কেউ না জানে।
হিন্দুর লাশ নেয় মুসলমানে
দাহ করে খোদ ব্রাহ্মণে।
মুসলিমের লাশ খেরেস্টানে
বয়ে নিয়ে যায় গোরস্তানে।
তবে সব ধর্মে কিছু ভণ্ড আছে
ধর্মের দোহাই তাদের কাছে
এর জাত গেল, ওর গেল কুল
গোল বাধায় আর তোলে আঙুল।
রাষ্ট্র বলছে আইনের ভাষায়
কান দেবে না ভণ্ডের কথায়
রুখতে হবে এসব ভণ্ড
ফ্যাসাদ করলে দেব দণ্ড।
শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান
করছি আমরা নিত্য
কেউবা ধনী কেউবা গরিব
কেউবা নিম্নবিত্ত।

দিবারাত্রি

রুস্তম আলী

কঠিন পথ চলা, নয় অবহেলা।
সেটাই বাস্তবতা, যেটা নিয়ে করো তুমি অবহেলা।
আসুক ঝড়, আসুক তুফান।
শক্ত হাতে ধরতে হবে হাল।
এবং মানতে হবে বিধির বিধান।
কেউ কারো নয়, এ পৃথিবী শুধুই মিথ্যা মায়াময়।
দিবারাত্রি কতই না কঠিন ঘানি টানি।
হিসাবের খাতা খুলে দেখি
শূন্য দিচ্ছে টানি।
তবুও মায়ার বাঁধন
বসে বসে ভাবি
সবাই আপনজন।
আর নয় ভয়, মিথ্যা প্রশ্রয়
আলো-আঁধারে নয় স্লোগান।
যতই সময় যায়
সামনে দেখি হিমালয়
দিবারাত্রি সঙ্গে নাই কোনো যাত্রী।

মানুষ

তারিকুল আমিন

অলিতে-গলিতে পড়ে থাকা মানুষ
তার কাছে নেই কোনো–
জাতপাত ধর্মের বিরোধ,
সেও জানে, তার প্রথম পরিচয় সে মানুষ।
ক্ষুধার রাজ্যে ধর্ম মানে না
মানে না কোনো জাত,
সবার ক্ষুধার জ্বালা এক
এ রহস্য এক বিধাতার গড়া।
অন্ধকার আর আলোর মাঝে
রয়েছে আকাশ-পাতাল ফারাক
তবুও তারা এক আকাশে
রয়েছে বিবাদ ছাড়া।
ক্ষুধার জ্বালায় হাত পাতে দ্বারে দ্বারে
দেখে না সে কোন ধর্মের,
তবে কেন এ ধরায়–
দ্বন্দ্ব হয় ধর্মে ধর্মে।
ধর্ম কখনও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে না
দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেনি আমার প্রিয় নবি
ধর্ম যার যার উৎসব তার তার,
করো না এ নিয়ে তোমরা ধর্মে ধর্মে বিবাদ।
সূর্য ও চাঁদ যদি এক আকাশে থাকে
যার যার ধর্ম সে সে মিলিত হয়ে কেন
থাকতে পারবো না কেন এই ভূখণ্ডে।
এসো হে মানব– মানুষ হই
গড়ি নিজ ধর্মের আলোকে শান্তির অট্টালিকা।

স্মৃতি

মনির জামান

কিছু স্মৃতি তালাবদ্ধ, ফেলে দিয়েছি চাবি
কিছু আবার ধাঁধাচিত্রে গহীন চিত্ত দহে,
গল্প কখনও উঠলে কোথাও ভীষণ হিসাবি
কিছু তার কলস্বরা নদীর মতন বহে!
কিছু স্মৃতি অনুরাগে পূর্ণ কানায় কানায়
শারদরোদে বলগাহরিণ ধানসবুজের আভায়,
কিছু অপমানের ঘৃণার প্রতিশোধের হৃদয়ের ধসে,
কিছু আছে লাগাম ধরে মারছে চাবুক কষে!
বইঠাহীন স্মৃতির তরী ভাসছে উজান তীরে
কাটছে কোথাও বুকের খাঁচা সূক্ষ্মতমা হীরে!

দোয়েলের দেশে

কাব্য কবির

সকালবেলা ঘুমটা ভাঙে দোয়েল পাখির শিসে,
সমীরণে দোয়েলের শিস থাকে যেন মিশে।
এই কারণে ভোরের হাওয়ায় হৃদয়টা যায় ভিজে,
ভোরের হাওয়ায় মন ভেজাতে ভালো লাগে কী যে!
সকালবেলা দোয়েল পাখি ডুমুরগাছের ডালে,
মিষ্টিমধুর শিস দেয় পাখি নাচে ছন্দতালে।
মিষ্টিমধুর শিস শুনিতে ভালো লাগে মনে,
আমার মনের ইচ্ছেগুলো বলি পাখির সনে।
নিজকে ভাবি সার্থক দোয়েলেরই দেশে,
সাদা-কালো দোয়েল পাখি যাবো ভালোবেসে।

কবিতা সরল

আসাদ আহমেদ

মৃত্যু আমাকে নিবে
নিশ্চিত জানি পুনরায় দরজা খোলার পর
জন্মপূর্ব মুহূর্ত জানি না
জানি না মৃত্যুর পরের রং
দুনিয়ার রং মাত করেছে অন্তর
অন্তর্যামী কোন পরমে আছে পরমতা
এই খোঁজে গৃহহীন হইনি বুদ্ধের মতো
কোনো বাণীর অর্থ খুঁজিনি
খুঁজি নাই বন্ধুর পথে হৃদয় ভাঙা গান
শুধু মধ্যরাতে পাঁজর ভেঙে ছুটে গেছে লাস্ট ট্রেন
আশ্চর্য ভোরের মুহূর্তে রক্ত-মুমূর্ষুতা কিছু নাই।

বুনোঘাস

মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ

শীতের সকাল বুনোঘাসে শিশির জমে আছে
ইশারাতে ওই ডেকে যায় ঘাসগুলো খুব কাছে।
শিশির ভেজা বুনোঘাসের রূপেই থমকে পড়ি
আমন ধানের পাতায় পাতায় করছে জড়াজড়ি।
মিষ্টিরোদে সকালবেলা আশার প্রদীপ জাগে
সাঁঝমালতি গন্ধ ছড়ায় সবার আগেভাগে।
বুনোঘাসের শিশিরগুলো রুপালি এক নদী
শীতের সকাল বাইরে এসো দেখবে নিরবধি।
বুনোঘাসের বুকে হাঁটে সাদা বকের সারি
হিমকুয়াশায় ঘিরে থাকে গাঁয়ের যত বাড়ি।
ভোর না হতেই পাখির মেলা জমে বুনোঘাসে
শীতের সকাল রোদের আলোয় খিলখিলিয়ে হাসে।

শীতের বার্তায়

আব্দুল আউয়াল রণী

শীতের আগমনে
মন নাচে আপন মনে।
শীতের উপকরণের বার্তায়
কত আবেদন-নিবেদন উদয়।
কত কল্পনারাজির বায়না
কত আয়োজন আনন্দ-উল্লাসের বন্দনা।
কত আনন্দ ভ্রমণ
কত স্বজনপ্রীতির আপ্যায়ন।
চাঞ্চল্যের উল্লাসে বন-বনাঞ্চল
শরতের ঐ কাশবন।
গাঁয়ের ঐ মেঠোপথে
বিন্দু বিন্দু শিশির কণায়।
প্রভাতের সূর্যের আলোয়
জ্বল জ্বল করে মুক্তার ন্যায়।
কৃষানেরা সব ধান কাটে
জৌলুসপূর্ণ কর্মতৎপরতায়।
পাকা ধান যায় বাড়ির আঙিনায়
মাড়াই ঝাড়াই বস্তা বোঝাই।
সোনালি পণ্য যায় হাটবাজারে
গ্রাহক সেবার কেনাবেচাই।

হেমন্তের গ্রাম

আবীর আহমেদ উল্যাহ

শরৎ শেষে শীতের আগে
আসে হেমন্ত
না বেশি শীত, না বেশি গরম
ছায়া বেহেস্ত।
কার্তিক-অগ্রহায়ণেতে
নবান্নের উৎসব
পাকা ধানের মৌ-মৌ গন্ধে
চাষির কলরব।
এমন দিনে পিঠা-পায়েস
হয় যে আয়োজন
একে অন্যকে নিলয়ে
করেন নিমন্ত্রণ।
হিন্দু-মুসলিম, একই গ্রামের
কেউবা নয়তো পর
জারি, সারি, বাউল গানের
বসে যে আসর।
ধপাস ধপাস ঢেঁকির সাথে
পায়ের মল বাজে
সরোদেরই সুর লহরি
পাই চিত্তের মাঝে।
পল্লি মায়ের এমন রূপ আর
কোনো দেশে নাই
হেমন্তের গ্রাম, জন্মদাত্রী
স্বর্গের সওগাত ভাই।

আলো ঝলমল হেমন্তে

এস এম শহীদুল আলম

আলো ঝলমল হেমন্তে–
মাঠভরা ধান
কিষানের গান
সুর অফুরান
ডাক পড়ে যায় নেমন্তে।
ছন্দ-মিলের এই কালে–
কাব্য আসে মনে
প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
বন্ধু জনে জনে
বাজে বাঁশি সেই তালে।

হেমন্ত

শাহজাহান মোহাম্মদ

শিশির ভেজা সকাল যেন
কুয়াশা চাদর নিয়ে
প্রকৃতিতে নতুন বার্তা
হেমন্তকে দিয়ে।
মাঠে মাঠে চোখ জুড়ানো
সোনারঙের ধান
মৌ মৌ গন্ধে মাখা
গ্রামবাংলার প্রাণ।
মুক্ত আকাশ জ্যোৎস্না ভরা
শশী মাখা রাত
শিউলি ফুলের অনুরাগে
রাঙা বধূর হাত।
রাখালিয়া বাঁশির সুরে
ফুল পাখিদের গান
কৃষান বালক কাস্তে হাতে
কাটে পাকা ধান।
নতুন ধানের নতুন চালের
পিঠা-পুলির ঘ্রাণ
নবান্নের উৎসবে আজ
বহে খুশির বান।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১লা নভেম্বর বঙ্গভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত 'জাতীয় যুব দিবস ২০২১'-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন– পিআইডি

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ছিলেন কৃষি অন্তপ্রাণ

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন কৃষি অন্তপ্রাণ। সদ্য স্বাধীন দেশ পুনর্গঠনে জাতির পিতা কৃষি বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। তিনি কৃষির উন্নয়নে কৃষকদের মাঝে খাস জমি বিতরণ, ভরতুকি মূল্যে সার, কীটনাশক, উন্নত বীজ, সেচ ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করেন। জাতির পিতা গ্রামীণ ও কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে যে উন্নত, সুখী ও সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন, সে স্বপ্ন বাস্তবায়নে সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। ১৬ই অক্টোবর 'বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২১' উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন। এ বছরের প্রতিপাদ্য– 'আমাদের কর্মই আমাদের ভবিষ্যৎ। ভালো উৎপাদনে ভালো পুষ্টি আর ভালো পরিবেশেই উন্নত জীবন' যথার্থ হয়েছে বলে তিনি মনে করেন।

সরকারের যুগোপযোগী নীতি ও পদক্ষেপে দেশ দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, ফল-সবজির উৎপাদন অনেক গুণ বেড়েছে। দেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে উৎপাদিত মাছ এবং মাংস উৎপাদনে দেশের চাহিদা পূরণে সক্ষমতা অর্জিত হয়েছে। বাংলাদেশের কৃষিপণ্য রপ্তানি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষিকে লাভজনক করতে কৃষি যান্ত্রিকীকরণে উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি রোধকল্পে গতিসীমা মেনে চলা আবশ্যক

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, বাংলাদেশে উন্নত সড়ক অবকাঠামো বৃদ্ধির সাথে সাথে সড়কপথে মোটরযানের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব যানবাহনের অনিয়ন্ত্রিত গতি সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। তাই জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি রোধকল্পে গতিসীমা মেনে চলা আবশ্যক। ২২শে অক্টোবর 'জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস ২০২১' উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন। এ বছরের প্রতিপাদ্য– 'গতিসীমা মেনে চলি, সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করি' যথার্থ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে তিনি মনে করেন।

উন্নত যোগাযোগ অবকাঠামো এবং পর্যাপ্ত পরিবহণ সেবা টেকসই আর্থসামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পরিবহণ ব্যয় ও মূল্যবান সময়ের সাশ্রয় খুবই প্রয়োজন। আধুনিক সড়ক পরিবহণ অবকাঠামো এবং দক্ষ পরিবহণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় বর্তমান সরকার দেশীয় সম্পদ ব্যবহারসহ বৈদেশিক বিনিয়োগের মাধ্যমে পরিবহণ ব্যবস্থার আধুনিকায়নে নিরলস প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। এ খাতে চলমান গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে– জাতীয় মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ, এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ, ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ও বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট নির্মাণ।

রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, সড়ক অবকাঠামো উন্নয়নের সাথে সাথে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। সড়ক দুর্ঘটনাজনিত জীবনহানি এবং শারীরিক ও আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে সড়ক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি গ্রহণের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে পরিবহণ মালিক, শ্রমিক, যাত্রী, পথচারী নির্বিশেষে সকলের এ সংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধান জানা এবং তা মেনে চলা আবশ্যক।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন সমন্বিতভাবে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের সর্ববৃহৎ গন্তব্য

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের শ্রেণিতে উত্তরণের পরও বাংলাদেশের জন্য বাণিজ্য ক্ষেত্রে প্রদত্ত অগ্রাধিকার সুবিধাদি অব্যাহত রাখার জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতি আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ। বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের আবাসিক রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইলি (Charles Whiteley) ৫ই অক্টোবর বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির নিকট পরিচয়পত্র পেশ করার সময় রাষ্ট্রপতি এ আহ্বান জানান। এ সময় রাষ্ট্রপতি বলেন, গোটা ইউরোপীয় ইউনিয়ন সমন্বিতভাবে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের সর্ববৃহৎ গন্তব্য। এছাড়া তারা বাংলাদেশে বিনিয়োগের অন্যতম প্রধান উৎস। বিগত দিনে বাংলাদেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তারা বাংলাদেশের উন্নয়নের অন্যতম আস্থাশীল অংশীদারে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের সঙ্গে তাদের এ সম্পর্ক আগামী দিনগুলোতে আরও বৃদ্ধি পাবে বলে রাষ্ট্রপতি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

পায়রা সেতুর উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৪শে অক্টোবর গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কের লেবুখালীতে পায়রা নদীর ওপর নির্মিত পায়রা সেতুর উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই সেতু উদ্‌বোধনের মধ্য দিয়ে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে নিরবচ্ছিন্ন যাতায়াতের পথ খুলে গেল। একইসঙ্গে তিনি ঢাকা-সিলেট ও ঢাকা-তামাবিল উভয় মহাসড়কে পৃথক এসএমভিটি লেনসহ ছয় লেন নির্মাণকাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৪শে অক্টোবর ২০২১ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে পায়রা সেতুর উদ্‌বোধন করেন– পিআইডি

সেনাবাহিনীকে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭শে অক্টোবর গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর মুজিব রেজিমেন্ট ও রওশন আরা রেজিমেন্টকে পতাকা হস্তান্তর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলাসহ আর্থসামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা উল্লেখ করেন। তিনি দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষাসহ যে-কোনো জাতীয় প্রয়োজনে এ বাহিনীকে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে সদা প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ চট্টগ্রামের হালিশহরে আর্টিলারি সেন্টার অ্যান্ড স্কুলে ৪, ১২ ও ২০ ফিল্ড, ৫ এয়ার ডিফেন্স রেজিমেন্ট আর্টিলারি, ৫ ও ৭ রিভারাইন ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়ন, ১ ও ২ সিগন্যাল ব্যাটালিয়ন, আর্মি এভিয়েশন গ্রুপ এবং এনসিও একাডেমিকে জাতীয় পতাকা প্রদান এবং মুজিব রেজিমেন্ট ও রওশন আরা রেজিমেন্টকে আর্টিলারির নতুন পতাকা প্রদান করেন।

জলবায়ু সম্মেলনে অংশগ্রহণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩১শে অক্টোবর স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত জলবায়ু সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য যুক্তরাজ্যের উদ্দেশে রওনা হন। স্থানীয় সময় ২টা ৫৫ মিনিটে গ্লাসগোর প্রেস্টউইক বিমানবন্দরে পৌঁছান। প্রধানমন্ত্রী ১লা নভেম্বর স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোয় ২৬ তম জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন (কপ-২৬)-এর মূল অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী প্যারিস সম্মেলনের প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দেন এবং তার আলোকে কার্বন নির্গমন কমিয়ে আনার জাতীয় মাত্রা নির্ধারণের জন্য উন্নত দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানান। সম্মেলনে চারটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন তিনি। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর জোট সিভিএফ-এর চেয়ারপারসন হিসেবেও এ সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় বিশ্বের সব দেশকে একসঙ্গে লড়তে হবে বলে উল্লেখ করে বলেন, না হলে কোনো দেশই জলবায়ু পরিবর্তনের মারাত্মক পরিণতি থেকে রেহাই পাবে না। তিনি ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম (সিভিএফ) ও কমনওয়েলথ সদস্যদের প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নে সব দেশকে একত্রে কাজ করার আহ্বান জানান। ২রা নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী গ্লাসগোতেই প্রবাসী বাংলাদেশিদের এক নাগরিক সংবর্ধনায় ভার্চুয়ালি যুক্ত হন। সংবর্ধনায় প্রধানমন্ত্রী প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশে আরও বিনিয়োগ করার আহ্বান জানান এবং নানা উদ্যোগের পরও কোথাও কোনো বাধা থেকে থাকলে সরকার দূর করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন। ৩রা নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী স্কটিশ পার্লামেন্ট 'কল ফর ক্লাইমেট প্রসপারিটি' শীর্ষক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে তিনি সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি, নদীভাঙন, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, বন্যা ও খরার মতো প্রাকৃতিক ঘটনায় প্রভাবিত জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাস্তুচ্যুত হওয়া জলবায়ু অভিবাসীদের দায়িত্ব বিশ্বকে ভাগ করে নেওয়ার আহ্বান জানান। ৪ঠা নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী লন্ডনের কুইন এলিজাবেথ সেন্টারের চার্চিল হলে আয়োজিত 'বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২১: বিল্ডিং সাসটেইনেবল গ্রোথ পার্টনারশিপ অ্যান্ড রোড শো'র উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে উন্নয়ন যাত্রায় অংশীদার হতে ব্রিটিশ উদ্যোক্তাদের বাংলাদেশে বিনিয়োগ করার এবং একইসঙ্গে প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিনিয়োগ করতে আহ্বান জানান। একই দিন সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী লন্ডনের দ্য ক্লারিজ হোটেলে তাঁর লেখা *সিক্রেট ডকুমেন্ট অব ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ অন ফাদার অব দ্য নেশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহামান* ও *মুজিব এবং পরিচিতি* দুটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন। ৭ই নভেম্বর লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনার ভবনের সম্প্রসারিত অংশ এবং বঙ্গবন্ধু লাউঞ্জের উদ্‌বোধন করেন। এসময় তিনি প্রবাসীদের অবদানের কথা তুলে ধরেন এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের যথাযথভাবে সেবা দিতে কূটনীতিকদের নির্দেশ দেন।

প্রতিবেদন : সুলতানা বেগম

দেশের বিজয়কেতনের ভিত গড়েছেন বঙ্গবন্ধু

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জলে-স্থলে-অন্তরিক্ষে দেশের বিজয়কেতনের ভিত রচনা করেছেন। বঙ্গবন্ধুর হাতে বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপনে স্যাটেলাইট প্রযুক্তির সূত্রপাত, আনক্লজের সদস্যপদ গ্রহণের ফলে এক লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটারের বেশি টেরিটোরিয়াল সমুদ্রসীমায় অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ-ভারত স্থল সীমান্ত চুক্তির ফলে ছিটমহল সমাধান হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। ৭ই অক্টোবর রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিএল) আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১'-এর মাধ্যমে দেশের বেসরকারি স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলসমূহের সম্প্রচার শুরুর ২য় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন তিনি। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস, অনলাইনে যুক্ত ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব মো. আফজাল হোসেন এবং অ্যাসোসিয়েশন অব টেলিভিশন চ্যানেল ওনার্স (এটকো) সভাপতি অঞ্জন চৌধুরী।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ ১লা নভেম্বর ২০২১ ঢাকায় তথ্য ভবন মিলনায়তনে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট-এর ৮ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাসভা ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ২০১৮ সালের ১১ই মে যুক্তরাষ্ট্রের কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে দেশের প্রথম যোগাযোগ ও সম্প্রচার উপগ্রহ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে বিশ্বে ৫৭তম নিজস্ব স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারী দেশ হয় বাংলাদেশ। টিভি চ্যানেল মালিকদের এই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, আমরা সবাই নিজ দেশের স্যাটেলাইট ব্যবহার করতে পেরে গৌরব অনুভব করি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অচিরেই দেশের দ্বিতীয় স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ ও তৃতীয় স্যাটেলাইটের প্রস্তুতি দেশকে অনেক এগিয়ে নেবে।

জাতীয় প্রেসক্লাব সমাজ নির্মাণে ভূমিকা রাখবে

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ বলেন, ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় জাতীয় প্রেসক্লাব আগামী দিনগুলোতেও দেশপ্রেম, গণতন্ত্র ও মানবিক মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত থেকে বহুমাত্রিক সমাজ নির্মাণে ভূমিকা অব্যাহত রাখবে। জাতীয় প্রেসক্লাবের ৬৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ২২শে অক্টোবর রাজধানীর তোপখানা রোডে ক্লাব প্রাঙ্গণে আয়োজিত কেক কাটা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন। প্রেসক্লাব সদস্যদের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান এবং তাদের উজ্জ্বল কর্মময় জীবন কামনা করেন তিনি।

১৯৫৪ সালের ২০শে অক্টোবর পূর্ব পাকিস্তান প্রেসক্লাব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় প্রেসক্লাব। নীতিমালা অনুযায়ী নির্বাচিত কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত এ ক্লাবের প্রথম আজীবন সদস্য হলেন এন এম খান এবং ক্লাবের প্রথম সভাপতি ছিলেন মুজীবুর রহমান খাঁ। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি বাহিনীর অপারেশন সার্চ লাইটের সময় পুরো ক্লাব ভবনটি বিধ্বস্ত হয়ে যায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের ৫ই মার্চ তৎকালীন সভাপতি আবদুল আউয়াল খানের সভাপতিত্বে আনুষ্ঠানিক ক্লাব ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় ক্লাবের নাম জাতীয় প্রেস ক্লাব করা হয়।

স্বপ্নহীন-ভাষাহীনকে স্বপ্ন ও ভাষা দিতে পারে সাংবাদিকরা

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ বলেন, সমাজে যারা স্বপ্ন দেখতেও ভয় পায়, তাদেরকেও একজন সাংবাদিক স্বপ্ন দেখাতে পারে। সমাজে অনেক মানুষ আছে যারা কষ্ট-বেদনার কথা কাউকে বলতে পারে না, যাদের কষ্ট-বেদনার কথা কেউ ভাবে না। একজন সাংবাদিক তার কলমের মাধ্যমে, তার রিপোর্টিংয়ের মাধ্যমে টেলিভিশনে, পত্রিকায় এমনকি অনলাইনে তার কথাগুলো বলতে পারে। তার মুখে ভাষা দিতে পারে এবং তাকে সাহস জোগাতে পারে। ৩১শে অক্টোবর ঢাকায় একশনএইড বাংলাদেশ আয়োজিত 'একশনএইড ইয়াং জার্নালিস্ট মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড ২০২১' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি একথা বলেন।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী তরুণ সাংবাদিকদের জন্য পুরস্কার প্রবর্তন করায় একশনএইডকে ধন্যবাদ জানান এবং বলেন, এই পুরস্কার তরুণ সাংবাদিকদের পেশাগতভাবে উৎসাহিত করছে। একজন সাংবাদিক সমাজকে পথ দেখাতে পারে, সমাজের তৃতীয় নয়ন খুলে দিতে পারে, সমাজের অনুন্মোচিত বিষয়গুলো উন্মোচিত করতে পারে, সমাজ যেদিকে তাকায় না সেদিকে সমাজের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারে। পত্রিকায় শিশুদের পাতা প্রবর্তন করলে ভালো হবে, শিশুরা শিখবে, লিখবে এবং এই লেখা জীবন সংগ্রামের পথে, স্বপ্ন পূরণের পথে তাদেরকে সহায়তা করবে।

প্রতিবেদন : শারমিন সুলতানা শান্তা

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

কপ-২৬ সম্মেলনে বন কাটা বন্ধে বিশ্বনেতাদের চুক্তি

বৈশ্বিক উন্নয়ন কমাতে অন্যান্য তৎপরতার পাশাপাশি বনাঞ্চল সুরক্ষা জরুরি বিবেচনায় নিয়ে মতৈক্যে পৌঁছেছেন বিশ্বনেতারা। ২০৩০ সালের মধ্যে বনাঞ্চল ধ্বংস বন্ধ করার ব্যাপারে ১০০টিরও বেশি দেশের নেতারা একমত হয়েছেন। ২রা নভেম্বর স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে আয়োজিত কপ-২৬ সম্মেলনে এ চুক্তি করেন তারা। এই চুক্তির আওতায় বনভূমি রক্ষায় এক হাজার ৯২০ কোটি ডলার ব্যয় করতেও সম্মত হন তারা। একই দিন তাপমাত্রা দেড় ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে চলা দেশগুলোর জোটে যোগ দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। পাশাপাশি আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে মিথেল গ্যাস নিঃসরন ৩০ শতাংশ হ্রাস করতে সম্মত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীর ইউনিয়নসহ (ইইউ) প্রায় ৯০টি দেশ। এসব পদক্ষেপকে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন বিশ্লেষকরা।

পৃথিবীকে বাঁচাতে বন উজার বন্ধের পাশাপাশি নতুন করে সবুজায়নের ব্যাপারেও একমত হয়েছেন বিভিন্ন দেশের নেতারা। বনভূমি রক্ষায় এক হাজার ৯২০ কোটি ডলারের তহবিলের অর্থ ব্যয় হবে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ক্ষতিগ্রস্ত জমি পুনরুদ্ধার, দাবানল নিয়ন্ত্রণ ও আদিবাসী সম্প্রদায়কে সহযোগিতার মতো খাতগুলোতে। এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা। তবে একইসঙ্গে তারা মনে করিয়ে দিচ্ছেন ২০১৪ সালের এ সংক্রান্ত চুক্তির ব্যর্থতার কথা। ফলে শুধু সম্মত হওয়া নয়, এর যথাযথ বাস্তবায়নে মনোযোগী হতে হবে।

জলবায়ু সম্মেলনের আয়োজক দেশ যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন বলেছেন, পৃথিবীর ফুসফুস যে বনভূমি, সেটি পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় এই চুক্তি হবে মাইলফলক।

আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক খাদ্য ও মৎস্য মেলা ২০২১-এ বাংলাদেশের অংশগ্রহণ

দক্ষিণ কোরিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক খাদ্য ও মৎস্য মেলা ‘কুন আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক খাদ্য ও মৎস্য মেলা ২০২১-এ সিউল বাংলাদেশ দূতাবাস অংশগ্রহণ করেছে। বুসান মেট্রোপলিটন সিসি কর্তৃপক্ষ ও বুসান এক্সিবিশন অ্যান্ড কনভেনশন সেন্টার, ন্যাশনাল ফেডারেশন অব ফিশারিজ কো-অপারেটিভ এবং কোরিয়া ফিশারি ট্রেড অ্যাসোসিয়েশনের সম্মিলিত আয়োজিত এ মেলায় দক্ষিণ কোরিয়াসহ ১৪টি দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে।

৩ থেকে ৫ই নভেম্বর তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এ মেলায় বাংলাদেশি বিভিন্ন প্রজাতির মাছ যেমন– ইলিশ, রুই, পাঙ্গাস, তেলাপিয়া, শিং, বাগদা চিংড়ি, গলদা চিংড়ি, হরিনা চিংড়ি, মাও কাঁকড়া, ইল মাছ, কাতল মাছ, স্কুইড, ম্যাকারেল, চাইনিজ পসফ্রেট, সিলভার পসফ্রেট, সার ডিন, লেদার জ্যাক মাছ, টুনা এবং হেলিবাট মাছ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

অক্টোবরে পণ্য রপ্তানির রেকর্ড

মহামারির মধ্যেও পণ্য রপ্তানিতে রেকর্ড অব্যাহত রেখেছে বাংলাদেশ। সেপ্টেম্বরের রেকর্ড ভেঙে অক্টোবর মাসে সর্বোচ্চ পণ্য রপ্তানির নতুন রেকর্ড হয়েছে। অক্টোবরে ৪৭২ কোটি ডলার বা ৪০ হাজার ৫১৫ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানি করেছেন দেশের বিভিন্ন খাতের ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তারা। অতীতে আর কোনো মাসেই এ পরিমাণ পণ্য রপ্তানি হয়নি।

এর আগে সেপ্টেম্বর মাসে ৪১৭ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করা হয়। গত বছরের জুলাইয়ে তখনকার সর্বোচ্চ ৩৯১ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ। ২রা নভেম্বর রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) প্রকাশিত পরিসংখ্যান থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। ইপিবির তথ্য বলছে, ২০২১-২০২২ অর্থবছরের প্রথম চার মাসে রপ্তানি আয় ইতিবাচক ধারায় ফিরেছে, করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে আসার পর বিশ্বব্যাপী পোশাকের চাহিদা এবং খুচরা বিক্রেতা বেড়েছে। এ কারণে বাংলাদেশে নতুন অর্ডার আসছে, রপ্তানি বাড়ছে।

দেশে মাথাপিছু আয় বেড়েছে

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ হিসাবে দেশের মাথাপিছু আয় এখন দুই হাজার ৫৫৪ ডলার। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মাথাপিছু আয় ছিল দুই হাজার ২২৭ ডলার। নতুন হিসাবে মাথাপিছু আয় বেড়েছে আরও ৩২৭ ডলার। মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) হিসাব করার জন্য সম্প্রতি নতুন ভিত্তিবছর চূড়ান্ত করেছে। নতুন ভিত্তিবছরের হিসাবে এ আয় বেড়েছে। মাথাপিছু আয় কোনো ব্যক্তির একক আয় নয়। দেশের অভ্যন্তরের পাশাপাশি রেমিট্যান্সসহ যত আয় হয়, তা দেশের মোট জাতীয় আয়। সেই জাতীয় আয়কে মাথাপিছু ভাগ করে দেওয়া হয়। এদিকে গতবারের মতো এবারও মাথাপিছু জিডিপিতে ভারতকে ছাড়িয়ে গেছে বাংলাদেশ। অক্টোবরে দেওয়া আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২১ সালে চলতি মূল্যে বাংলাদেশের মাথাপিছু জিডিপি দুই হাজার ১৩৮ ডলার। আর ভারতের মাথাপিছু জিডিপি দুই হাজার ১১৬ ডলার।

সেবা রপ্তানিতে নতুন ইতিহাস

চলতি অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে সেবা রপ্তানি থেকে ৬৩

কোটি ১৭ লাখ ৩০ হাজার ডলার আয় করেছে বাংলাদেশ। বর্তমান বিনিময় হার হিসাবে (প্রতি ডলার ৮৫ টাকা ৬৫ পয়সা) টাকার অঙ্কে এই অর্থের পরিমাণ পাঁচ হাজার ৪১১ কোটি টাকা। এই রপ্তানি গত বছরের জুলাই মাসের চেয়ে প্রায় ৪০ শতাংশ বেশি। আর লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি ১০ শতাংশ। বাংলাদেশের ইতিহাসে এর আগে কখনই এক মাসে সেবা খাত থেকে এত বিদেশি মুদ্রা দেশে আসেনি। ২০২০-২১ অর্থবছরে পণ্য ও সেবা রপ্তানি থেকে মোট চার হাজার ৫৩৬ কোটি ৭২ লাখ (৪৫.৩৭ বিলিয়ন) আয় করে বাংলাদেশ। এর মধ্যে পণ্য রপ্তানি থেকে আয় হয় ৩৮ দশমিক ৭৬ বিলিয়ন ডলার; প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ১৫ দশমিক ১০ শতাংশ। ইপিবির তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, জুলাই মাসে সেবা খাতের মোট রপ্তানি আয়ের মধ্যে ৬২ কোটি ২৭ লাখ ডলারই এসেছে সরাসরি সেবা খাত থেকে। অর্থাৎ মোট রপ্তানির ৯৮ দশমিক ৫৬ শতাংশই এসেছে সরাসরি সেবা খাত থেকে। দেশের বন্দরগুলোতে পণ্যবাহী জাহাজগুলোর কেনা পণ্য ও সেবা এবং মার্চেন্টিংয়ের অধীনে পণ্য বিক্রির আয়।

প্রতিবেদন : শাহানা আফরোজ

ডিজিটাল বাংলাদেশ

বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট ২০২১

দেশ-বিদেশের স্টার্টআপদের অনুপ্রাণিত করতে আয়োজিত প্রতিযোগিতা বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট (বিগ) ২০২১ বিজয়ী হয়েছে বাংলাদেশের স্টার্টআপ 'ওপেন রিফ্যাক্টরি'। আন্তর্জাতিক এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠান এক লাখ মার্কিন ডলার অনুদান পেয়েছে।

৩০শে অক্টোবর রাজধানীর আগারগাঁওয়ের বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ অডিটোরিয়ামে প্রতিযোগিতার গ্র্যান্ড ফিনালে অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে অনুষ্ঠানের সভাপতির দায়িত্বে থাকা আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট বিজয়ী স্টার্টআপের নাম ঘোষণা করেন।

তরুণ উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের অধীনে উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প (আইডিয়া) প্রথমবারের মতো আয়োজন করে বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট (বিগ) ২০২১।

এই প্রতিযোগিতা সফলভাবে আয়োজনের জন্য ১২৮টি দেশের প্রচারণা করা হয়। এতে অংশ নেয় বাংলাদেশসহ ৫৭টি দেশের স্টার্টআপ। প্রতিযোগিতায় সাত হাজারেরও বেশি ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠান স্টার্টআপ বিজয়ী হওয়ার জন্য আবেদন করে। এর মধ্যে বাংলাদেশের একটি স্টার্টআপ জয়ী হয়ে এক লাখ মার্কিন ডলার পুরস্কার জিতে নেয়।

এছাড়া দেশি স্টার্টআপদের নিয়ে অনুষ্ঠিত রিয়েলিটি শো থেকে নির্বাচিত ২৬টি এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ১০টি স্টার্টআপ এবং দেশ-বিদেশে নির্বাচিত মোট ৩৬টি স্টার্টআপের প্রত্যেকেই পাচ্ছে ১০ লাখ টাকা করে মোট তিন কোটি ৬০ লাখ টাকার অনুদান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)-এর নির্বাহী পরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব ড. মো. আব্দুল মান্নান পিএএ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আইডিয়া প্রকল্পের পরিচালক ও যুগ্মসচিব মো. আব্দুর রাকিব।

সভাপতির বক্তব্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, ইনোভেশন ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার মাধ্যমে উদ্ভাবনী জাতি গঠন করার লক্ষ্যে অল্প দিনের মধ্যেই একটি স্টার্টআপ পলিসি প্রণয়ন করা হবে। ইতোমধ্যে দেশে আড়াই হাজার উদ্ভাবক তৈরি হয়েছে। তাদের ক্ষমতায়নের জন্য আইসিটি বিভাগ থেকে সার্বিক সহায়তা করা হবে। প্রতিবছরই বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট (বিগ) প্রতিযোগিতা হবে বলে ঘোষণা দেন প্রতিমন্ত্রী। সবশেষে বিজয়ী ওয়ান বিগ উইনার ২০২১ ও অন্যান্য বিজয়ী স্টার্টআপদের সম্মাননা প্রদানসহ তাদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেওয়া হয়।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

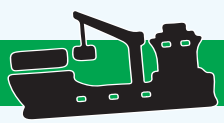

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার পেল ২৩টি শিল্পপ্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশের শিল্পায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য সাত ক্যাটাগরিতে মোট ২৩টি শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২০' দেওয়া হয়েছে। শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ ২৮শে অক্টোবর রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে নির্বাচিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিনিধিদের হাতে এ পুরস্কার তুলে দেন।

শিল্প মন্ত্রণালয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এ বছর প্রথমবারের মতো এ পুরস্কারটি প্রবর্তন করেছে।

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন ২৮শে অক্টোবর ২০২১ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে শিল্প খাতে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২০' প্রদান করেন– পিআইডি

শিল্পমন্ত্রী তার বক্তৃতায় বলেন, শিল্পোদ্যোক্তাদের অবদান এবং তাদের সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করতে শিল্প মন্ত্রণালয় এ পুরস্কারটি প্রবর্তন করেন।

বিদ্যমান জাতীয় শিল্পনীতিতে বর্ণিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী মোট সাত ক্যাটাগরির শিল্পের প্রতিটিতে তিন জন করে মোট ২১ জন শিল্প উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠানকে প্রতিবছর (১লা জুলাই-৩০শে জুন সময়ের জন্য) এ পুরস্কার দেওয়া হবে। এ বছর দুইটি ক্যাটাগরিতে যৌথভাবে দুটি করে প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত হওয়ায় মোট ২৩টি প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার দেওয়া হয়।

প্রথম পুরস্কার হিসেবে প্রত্যেককে ৩ লাখ টাকা ও ২৫ গ্রাম স্বর্ণখচিত ক্রেস্ট, দ্বিতীয় পুরস্কার হিসেবে প্রত্যেককে ২ লাখ টাকা ও ২০ গ্রাম স্বর্ণখচিত ক্রেস্ট এবং তৃতীয় পুরস্কার হিসেবে প্রত্যেককে ১ লাখ টাকা ও ১৫ গ্রাম স্বর্ণখচিত ক্রেস্ট দেওয়া হয়।

বৃহৎ শিল্প ক্যাটাগরিতে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড প্রথম, জজ ভূঞা টেক্সটাইল মিলস দ্বিতীয় এবং আদুরী এপারেলস লিমিটেড ও ইউনিভার্সেল জিন্স লিমিটেড যৌথভাবে তৃতীয় পুরস্কার লাভ করে।

মাঝারি শিল্প ক্যাটাগরিতে অকো-টেক্স লিমিটেড ও ফরচুন সুজ লিমিটেড যৌথভাবে প্রথম, রহিম আফরোজ রিনিউএবল এনার্জি লিমিটেড দ্বিতীয় ও মাধবদী ডাইং ফিনিশিং মিলস লিমিটেড তৃতীয় পুরস্কার লাভ করে।

ক্ষুদ্র শিল্প ক্যাটাগরিতে আমান প্ল্যাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজ প্রথম, এস আর হ্যান্ডিক্রাফটস দ্বিতীয় ও আলিম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড তৃতীয় পুরস্কার লাভ করে।

মাইক্রো শিল্প ক্যাটাগরিতে মেসার্স কারুকলা, ট্রিম টেক্স বাংলাদেশ, জনতা ইঞ্জিনিয়ারিং যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার লাভ করে এবং হাইটেক শিল্প ক্যাটাগরিতে সার্ভিস ইঞ্জিন লিমিটেড প্রথম, সুপার স্টার ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড দ্বিতীয়, মীর টেলিকম লিমিটেড তৃতীয় পুরস্কার লাভ করে।

হস্ত ও কারুশিল্প ক্যাটাগরিতে ক্লাসিক হ্যান্ডমেইড প্রডাক্টস বিডি প্রথম, আয়োজন দ্বিতীয় ও সোনারগাঁ নকশিকাঁথা মহিলা উন্নয়ন সংস্থা তৃতীয় পুরস্কার লাভ করেছে। সেই সঙ্গে কুটিরশিল্প ক্যাটাগরিতে কুমিল্লা আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস প্রথম, রংমেলা নারী কল্যাণ সংস্থা (আর এন কে এস) দ্বিতীয় ও অগ্রজ তৃতীয় পুরস্কার লাভ করেছে।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

শেখ হাসিনা মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়নে রোড ম্যাপ তৈরি

খুলনায় শেখ হাসিনা মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের খসড়া লোগো উন্মোচন, প্রস্তাবিত ক্যাম্পাসের সাইড ম্যাপ ও স্থাপনা নির্মাণ বিষয়ে বিস্তারিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয় হবে দেশের পঞ্চম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়। সরকার দ্রুততার সাথে শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস করেছে এবং এর উপাচার্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ২৫শে অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ব্রিফিং করেন। চিকিৎসা ক্ষেত্রে উন্নত মান, গবেষণার সুযোগ ও উন্নত প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা রয়েছে বলে উল্লেখ করেন স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব মো. আলী নূর।

প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে বিনিময়নোট ও অনুদান চুক্তি সাক্ষর

দেশের মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে বাংলাদেশের সঙ্গে 'বিনিময়নোট' ও অনুদান চুক্তি স্বাক্ষর করেছে জাপান। ২৫শে অক্টোবর আরডিতে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়। চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশে নিয়োজিত জাপানের রাষ্ট্রদূত নাওকি ইতো, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিভাগের সচিব ফাতিমা ইয়াসমিন এবং জাইকা-বাংলাদেশ-এর বাংলাদেশের প্রধান প্রতিনিধি ইউহো হায়াকাওয়া। এ খাতে অনুদানের পরিমাণ ৫০০ মিলিয়ন জাপানি ইয়েন, যা টাকার অঙ্কে ৩৭.৫১ কোটি।

প্রতিবেদন : মো. সেলিম

বিনিয়োগ: বিশেষ প্রতিবেদন

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্মেলন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সপ্তাহব্যাপী আন্তর্জাতিক 'বাংলাদেশ বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্মেলন-২০২১' উদ্‌বোধন করেন। যা সারা বিশ্বের নীতি নির্ধারক, ব্যবসায়ী নেতা এবং বিনিয়োগকারীদের একত্রিত করছে। বিনিয়োগকারী ও উদ্যোক্তাদের কাছে বাংলাদেশের প্রস্তুতি প্রদর্শন করাও এই শীর্ষ সম্মেলনের লক্ষ্য। প্রধানমন্ত্রী ২৬শে অক্টোবর ২০২১ তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) ভার্চুয়াল এই শীর্ষ সম্মেলনের উদ্‌বোধন করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এই আন্তর্জাতিক ভার্চুয়াল সম্মেলনের আয়োজন করে। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন, বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি এবং প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান। ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির

(এফবিসিসিআই) সভাপতি মো. জসিম উদ্দিনও সম্মানিত অতিথি হিসেবে যোগ দেন।

সপ্তাহব্যাপী এই বিনিয়োগ সম্মেলনে অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ সক্ষমতা ও সম্ভাবনার ওপর ভিত্তিতে বিশেষ করে অবকাঠামো (ভৌত অবকাঠোমো, লজিস্টিক্স ও জ্বালানি), আইটি/আইটিইএস ও ফিনটেক, চামড়াজাত পণ্য, ফার্মাসিউটিক্যালস, অটোমোটিভ ও হালকা প্রকৌশল, প্লাস্টিক পণ্য, কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, পাট ও বস্ত্র এবং এফএমসিজি (ফাস্ট মুভিং ভোগ্যপণ্য) এবং খুচরা ব্যাবসাসহ নয়টি খাত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বাংলাদেশসহ পাঁচটি মহাদেশের ৩৮টি দেশের ৫৫২টি কোম্পানি ৪৫০টি বিজনেস টু বিজনেস (বিটুবি) ম্যাচ মেকিং সেশনে অংশগ্রহণ করবে– যা বাংলাদেশে নতুন ব্যাবসার সুযোগ অন্বেষণ করতে এবং এফডিআই আকৃষ্ট করতে সাহায্য করবে। তাছাড়া, বিভিন্ন বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে ছয়টি ওয়েবিনারের আয়োজন করা হবে। যেখানে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ ও নীতিনির্ধারকরা অংশগ্রহণ করে এই বিষয়ে তাদের সুচিন্তিত মতামত দেবেন।

সৌদি ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগে আহ্বান

সৌদি আরবের হাইল প্রদেশের ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের আহ্বান জানান রাষ্ট্রদূত ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী। রাষ্ট্রদূত ৪ঠা নভেম্বর হাইলের চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি আবদুল আজিজ খালাফ আল জাকদির সঙ্গে বৈঠককালে এ আহ্বান জানান। রাষ্ট্রদূত বলেন, সৌদি ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের আওতায় বিনিয়োগ করতে পারে। সম্প্রতি এ বিষয়ে সৌদি আরবের সঙ্গে বাংলাদেশের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হওয়ায় এ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে বিনিয়োগে এগিয়ে আসার জন্য সৌদি ব্যবসায়ীদের অনুরোধ জানান। সৌদি ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে সকল সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন ২৩শে অক্টোবর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'উইমেন অ্যান্ড ই-কমার্স' আয়োজিত নারী উদ্যোক্তা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখা নারীদের জয়ী সম্মাননা-২০২১ প্রদান করেন– পিআইডি

এসময় চেম্বার সভাপতি বাংলাদেশের হালনাগাদ অর্থনৈতিক অগ্রগতি, সম্ভাব্য ব্যাবসায়িক খাতসমূহ যেখানে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা রয়েছে এবং সৌদি আরবের সঙ্গে ব্যাবসা করার সুযোগ রয়েছে সে সম্পর্কে সাম্প্রতিক তথ্য প্রদানের অনুরোধ জানান। এছাড়া বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের ব্যাবসায়িক খাতসহ বিস্তারিত প্রোফাইল পাঠাতে অনুরোধ করেন যা চেম্বার সদস্যদের মাঝে বিতরণ করা হবে এবং বাংলাদেশের সঙ্গে ব্যাবসা করতে উদ্বুদ্ধ করবে। চেম্বার সভাপতি জানান তাঁরা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন এবং বাংলাদেশের বিনিয়োগ ও ব্যাবসার সুযোগের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত হয়ে সফলতার অংশীদার হতে চায়।

প্রতিবেদন: এইচ কে রায় অপু

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

নারীদের বাদ দিয়ে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়

আফগানিস্তানের অর্থনীতিতে ৮০ শতাংশই অনানুষ্ঠানিক। সেখানে নারীদের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। নারীদের ছাড়া আফগান অর্থনীতি ও সমাজ পুনরুদ্ধারের কোনো উপায় নেই। জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস ১১ই অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

বার্তা সংস্থা এএফপি প্রতিবেদনে বলা হয়, জাতিসংঘ মহাসচিব বলেন, আফগান নারী ও মেয়ে শিশুদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি তালেবান রক্ষা করেনি। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হলে সেখানকার নারী ও মেয়ে শিশুদের স্বপ্ন ভঙ্গ হবে। নারী ও মেয়ে শিশু মনোযোগের কেন্দ্রে থাকা দরকার। আফগানিস্তানে ২০০১ সাল থেকে অন্তত ৩০ লাখ মেয়ে শিশু স্কুলে ভর্তি হয়েছে। গত কয়েক বছরে মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার হারও বেড়েছে বলে মহাসচিব জানান।

সম্পত্তিতে হিন্দু বিধবার অধিকার রয়েছে

আইনে কোনো সুনির্দিষ্ট সম্পত্তির কথা বলা নেই। সম্পত্তি শব্দের অর্থ সব সম্পত্তি যেখানে স্থাবর বা অস্থাবর বসতভিটা, কৃষিভূমি, নগদ টাকা বা অন্য কোনো ধরনের সম্পত্তি। কৃষিজমি ও বসতভিটার মধ্যে পার্থক্য করার সুযোগ নেই এবং এ ধরনের সম্পত্তি বিধবার বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয়। হিন্দু বিধবা নারী কৃষিজমি পাবেন না, শুধু বসতভিটা থেকে অর্ধেক পাবেন– এমন দাবি নিয়ে খুলনার এক হিন্দু পরিবারের করা আবেদনের শুনানি শেষে ২২ পৃষ্ঠার পূর্ণাঙ্গ রায় সম্প্রতি প্রকাশিত হয়। উপরোক্ত কথাগুলো এ রায়ের ব্যাখ্যায় বলেছে হাইকোর্ট। ১৯৩৭ সালের হিন্দু উইমেন্স রাইটস টু প্রোপার্টি অ্যাক্ট অনুসারে স্বামীর কৃষি-অকৃষি উভয় জমিতে বিধবা নারীর অধিকারের কথা আছে। আর এ আইনটি বাংলাদেশে প্রযোয্য বলে রায় দিয়েছে আদালত।

তবে এর আগে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ছেলে, ছেলের ছেলে এবং ছেলের ছেলের ছেলে থাকলে বিধবারা সম্পত্তি পেতেন না। উল্লেখ্য, ১৯৩৭ সালের এ আইনটি বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে গ্রহণ করে।

ভারোত্তলনে সোনা স্মৃতির কবজায়

জাতীয় ভারোত্তলন চ্যাম্পিয়নশিপে ৫৫ কেজি ওজন শ্রেণিতে রেকর্ড গড়ে সোনা জিতেছেন স্মৃতি আক্তার। নেপালে ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত এসএ গেমসে রুপা জেতা ফুলমতি চাকমাকে এবার হারিয়ে নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়ে তিনি জিতেছেন এ সেনা। ২৭শে সেপ্টেম্বর থেকে ১লা অক্টোবর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত জাতীয় ভারোত্তলন চ্যাম্পিয়নশিপে তিনি এ সোনা জিতেছেন।

২০১৩ সালে প্রথম ভারোত্তলন খেলা শুরু স্মৃতির খেলার সুবাদে ২০১৪ সালে চাকরি পেয়ে যান সেনাবাহিনীতে। এরপর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে। একের পর এক সাফল্য পেয়েছেন ভারোত্তলনে। খেলেছেন মিসরে ইসলামিক সলিডারিটি চ্যাম্পিয়নশিপে, থাইল্যান্ডে বিশ্ব ভারোত্তলন চ্যাম্পিয়নশিপে এবং নেপালে এসএ গেমসে।

প্রতিবেদন : জান্নাতে রোজী

সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে ২১ লাখ নারী

সময়ের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছেন নারীরা। প্রতিকূলতাকে জয় করে স্বাবলম্বী হচ্ছেন। আর নারীদের সহায়তায় চারটি সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে সরকার। এসব কর্মসূচির সুবিধাভোগী ২১ লাখের বেশি নারী। ভিজিডি কার্যক্রম, মাতৃত্বকালীন ভাতা কর্মসূচি, ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা কর্মসূচি, নারীদের আত্মকর্মসংস্থানে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। এর ফলে কর্মজীবী নারীরা যেমন স্বাবলম্বী হচ্ছেন, অন্যদিকে প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে উদ্যোক্তা হয়ে উঠছেন অনেকে।

ভিজিডি কর্মসূচি

সরকারের সর্ববৃহৎ সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি ভিজিডি। এই কর্মসূচির উপকারভোগীরা সবাই নারী। এক্ষেত্রে প্রতিটি চক্র দুই বছর অর্থাৎ ২৪ মাস মেয়াদি। ভিজিডি উপকারভোগীকে মাসে ৩০ কেজি গম বা চাল (প্রাপ্যতার সাপেক্ষে) এবং তিনটি পার্বত্য জেলার ২৫টি উপজেলায় মাথাপিছু ৩০ কেজি করে আতপ চাল বিতরণ করা হচ্ছে।

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

ভিজিডি উপকারভোগী নারীদের উন্নয়ন প্যাকেজ সেবার আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ৬৪টি জেলায় কার্যক্রম চলছে। উন্নয়ন প্যাকেজ সেবার আওতায় এনজিওগুলো প্রশিক্ষণ, সামাজিক সচেতনতা, আয়বর্ধক উদ্যোক্তা উন্নয়ন, সঞ্চয় এবং চাহিদার ভিত্তিতে ক্ষুদ্রঋণ দিচ্ছে। উপকারভোগীরা সাপ্তাহিক ১০ টাকা করে মাসে ৪০ টাকা সঞ্চয় জমা করছেন। এই টাকা এনজিও এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার যৌথ অ্যাকাউন্টে জমা রাখা হয়। চক্র শেষ হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে মুনাফাসহ সঞ্চয়ের জমাকৃত টাকা উপকারভোগীদের মাঝে বিতরণ করা হয়। উপকারভোগী নারী ইচ্ছা করলে এনজিওদের নিকট থেকে ঋণ নিয়ে ক্ষুদ্র ব্যাবসা করতে পারেন। সেক্ষেত্রে এনজিও তাদের উৎপাদন, বাজারজাত ও অন্যান্য বিষয়ে সহযোগিতা করবে।

কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল কর্মসূচি

এটি মায়েদের সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের প্রতি জাতীয় স্বীকৃতি। এই সহায়তা দরিদ্র মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, পুষ্টির উন্নয়নে দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে গর্ভধারণকাল থেকে ৩৬ মাস পর্যন্ত ৫০০ টাকা হারে নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। বাল্যবিয়ে ও যৌতুকের জন্য নির্যাতন রোধকল্পে শুধু ২০ বছরের অধিক বয়সি দরিদ্র কর্মজীবী গর্ভবতী-দুগ্ধদায়ী মায়েদের ক্ষেত্রে প্রথম বা দ্বিতীয় গর্ভধারণকালে এ ভাতা দেওয়া হয়। বর্তমানে ভাতাভোগীর সংখ্যা দুই লাখ ৭৫ হাজার।

দরিদ্র মায়ের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা কর্মসূচি

এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য দরিদ্র মা ও শিশুমৃত্যু হার হ্রাস, মাতৃদুগ্ধ পানের হার বৃদ্ধি, গর্ভাবস্থায় উন্নত পুষ্টি উপাদান গ্রহণ বৃদ্ধি। এর আওতায় দরিদ্র গর্ভবতী নারীদের ভাতা প্রদানের পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত এবং অন্যান্য বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে এনজিও-সিবিও-এর মাধ্যমে কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্তমানে ভাতাভোগীর সংখ্যা সাত লাখ ৭০ হাজার।

প্রতিবেদন : মেজবাউল হক

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

করোনাকালেও ফসলের উৎপাদন বেড়েছে

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, করোনাকালে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী কৃষি মন্ত্রণালয় সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ফলে করোনাকালেও দেশে খাদ্য উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রয়েছে এবং তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে রেকর্ড পরিমাণ বোরো উৎপাদন হয়েছে দুই কোটি টনেরও বেশি, যা দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। গত বছরের তুলনায় এ বছর সকল ফসলের উৎপাদনই বেড়েছে। মোট চালের উৎপাদন হয়েছে তিন কোটি ৮৬ লাখ টন, গম ১২ লাখ টন, ভুট্টা প্রায় ৫৭ লাখ টন, আলু এক কোটি ৬ লাখ টন, শাকসবজি এক কোটি ৯৭ লাখ টন, তেল ফসল ১২ লাখ টন ও ডাল ফসল ৯ লাখ টন। বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১৫ই অক্টোবর ঢাকার ফার্মগেটে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের (বিএআরসি) মিলনায়তনে প্রেস ব্রিফিংয়ে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। কৃষি মন্ত্রণালয় এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) আয়োজিত এ প্রেস ব্রিফিংয়ে সভাপতিত্ব করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. মেসবাহুল ইসলাম ও গেস্ট অব অনার হিসেবে বক্তব্য রাখেন এফএও'র বাংলাদেশ প্রতিনিধি রবার্ট ডি. সিম্পসন। এ সময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সংস্থা প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, পেঁয়াজে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে এক বছরেই কৃষি মন্ত্রণালয় সাত লাখ টন উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে।

এ বছর ৩৩ লাখ টন পেঁয়াজ উৎপাদন হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৬ই অক্টোবর কৃষি মন্ত্রণালয় ও জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)-এর যৌথ উদ্যোগে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও পালিত হয় 'বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২১'। এবারের প্রতিপাদ্য–'আমাদের কর্মই আমাদের ভবিষ্যৎ– ভালো উৎপাদনে ভালো পুষ্টি, আর ভালো পরিবেশেই উন্নত জীবন'। এ বছর দিবসটির গুরুত্ব তুলে ধরতে কৃষি মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। দিবসের প্রথমভাগে সকালে ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে প্রতিপাদ্যের ওপর একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ স্মরণীয় করে রাখার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম গ্রহণ করে। তার অংশ হিসেবে এ সেমিনারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) প্রকাশিত *100 Years of Agricultural Development in Bangladesh* বইয়ের মোড়ক উন্মোচন এবং বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) উদ্ভাবিত 'বঙ্গবন্ধু ধান ১০০' অবমুক্ত করেন। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী 'বঙ্গবন্ধু ধান ১০০' দিয়ে নির্মিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি উন্মোচন করেন।

কৃষি উদ্যোক্তা তৈরিতে সেল গঠন

দেশে কৃষি উদ্যোক্তাদের উৎসাহ দিতে ও নতুন উদ্যোক্তা তৈরি করতে কৃষি মন্ত্রণালয়ে একটি পৃথক সেল গঠন করা হবে বলে জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, দেশে এখন কৃষি উদ্যোক্তা তৈরি ও তাদের উৎসাহিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সারা দেশে কৃষি উদ্যোক্তারা কে কী ফসল চাষ করবে, কোন ধরনের কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাত করবে, তাদের কী সহযোগিতা দরকার–এ সকল বিষয়ে দেখভাল, সহযোগিতা ও যোগাযোগ রক্ষা করবে এই সেল। ২৩শে অক্টোবর ঢাকার ফার্মগেটে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) মিলনায়তনে কৃষি উদ্যোক্তা সম্মেলনের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড, স্বেচ্ছাসেবী নাগরিক সংগঠন বিসেফ এবং বিকশিত বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। দেশের কৃষি উদ্যোক্তা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিদ্যমান দূরত্ব কমিয়ে আনার উপায় খোঁজা, সহজ শর্তে ঋণ প্রদান ও মানবিক অর্থায়নে সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারিত করতে 'ভরসার নতুন জানালা' শিরোনামে এ সম্মেলনের আয়োজন। দেশের ৩৩টি জেলা থেকে কৃষি উদ্যোক্তারা এতে অংশগ্রহণ করেন।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, এ বছর সারা দেশে ২৮ হাজার কোটি টাকারও বেশি কৃষিঋণ বিতরণের খোঁজখবর রাখতে মন্ত্রণালয়ের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। কৃষকেরা সঠিকভাবে ঋণ পাচ্ছে কি না, ঋণ পেতে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে ও অতিরিক্ত খরচ হচ্ছে কি না, কোন জেলায় কী পরিমাণ ঋণ বিতরণ হচ্ছে– এসব বিষয়ে খোঁজখবর রাখতে ইতোমধ্যে কঠোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

আগাম 'বিনা' ধানে কম খরচে বেশি ফলন

ফসলের মাঠগুলোতে এখন ঢেউ খেলছে আমন ধান। যেগুলোর কোথাও ফুল ফুটে (ফ্লাওয়ারিং স্টেজ) রয়েছে, আবার কোথাও ধান শুরু করেছে চালও হতে (মিল্কিং স্টেজ)। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) উদ্ভাবিত আমন মৌসুমের আগাম জাতের ধান এরই মধ্যে কাটা হয়ে গেছে। অর্থাৎ প্রায় একমাস আগেই এসব ধান উঠছে কৃষকের ঘরে। তাই এসব আগাম জাতের ধান নিয়ে রীতিমতো উৎসব চলছে বিভিন্ন এলাকায়। কারণ উচ্চফলনশীল হওয়ায় এ বছর জাতগুলোর ফলনও হয়েছে বেশ ভালো। এসব ধান চাষ করতে সময় কম লাগাতে খরচও হয়েছে কম। তাই বিনা উদ্ভাবিত স্বল্প সময়ের জাত বিনা ধান-৭, বিনা ধান-১১, বিনা ধান-১৬, বিনা ধান-১৭, বিনা ধান-২০ এবং বিনা ধান-২২ এরই মধ্যে জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করেছে সারা দেশে।

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক ২৩শে অক্টোবর ফার্মগেটে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল মিলনায়তনে 'কৃষি উদ্যোক্তা সম্মেলন ২০২১'-এর উদ্‌বোধন অধিবেশনে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

এসব জাতের বিঘাপ্রতি ফলন প্রায় ছয় টন, যা আমনে চাষ হওয়া অন্য গতানুগতিক জাতের চেয়ে এক থেকে দেড় টন বেশি। পাশাপাশি স্বল্প সময়ের কারণে দ্রুত ধান কেটে রবিশস্য চাষ করা যাচ্ছে একই জমিতে। এ কারণে বেশি লাভবান হচ্ছেন কৃষক।

প্রতিবেদন : এনায়েত হোসেন

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকারের পদক্ষেপসমূহ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমান বলেন, ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব, ঘনবসতি ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশকে প্রতিনিয়ত কোনো না কোনো প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট দুর্যোগের মোকাবিলা করতে হয়। তাছাড়া

CVF চেয়ার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১লা নভেম্বর ২০২১ স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে কপ-২৬ উপলক্ষে কমনওয়েলথ প্যাভিলিয়নে আয়োজিত CVF-Commonwealth High-level Panel Discussion on Climate Prosperity Partnership শীর্ষক সাইড ইভেন্টে প্রধান অতিথির ভাষণ দেন– পিআইডি

২০১৯ সালে ঘূর্ণিঝড় ফণী ও বুলবুল এবং ২০২০ সালে ঘূর্ণিঝড় আম্পান মোকাবিলা করতে হয়েছে বাংলাদেশকে। এসব ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় সরকারের পূর্বপ্রস্তুতি থাকায় জানমালের ক্ষয়ক্ষতি অনেক কম হয়েছে। এ বছর ঘূর্ণিঝড় 'ইয়াস' মোকাবিলায়ও সরকারের ব্যাপক প্রস্তুতি ছিল। দারিদ্র্যমোচনসহ সামাজিক নিরাপত্তা অর্জনে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বাংলাদেশের অর্থনীতিকে করেছে সমৃদ্ধ। দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগ প্রশংসিত হয়েছে সারা বিশ্বে।

প্রতিমন্ত্রী ৩রা অক্টোবর ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০২১' উপলক্ষে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ডে করণীয় বিষয়ে সচেতনতামূলক মহড়া'য় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙন, খরা, শৈত্যপ্রবাহ, অগ্নিকাণ্ড, বজ্রপাত এবং ভূমিধস আমাদের অতি পরিচিত দুর্যোগ। জনসচেতনতা ও পূর্বপ্রস্তুতি থাকলে যে-কোনো দুর্যোগ মোকাবিলা করে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব। আর শেখ হাসিনার সরকার সে কাজটাই করে যাচ্ছে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পরই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ত্রাণনির্ভর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আগাম সতর্কবার্তা প্রচার ব্যবস্থা শুরু করেন। উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জীবন ও সম্পদ বাঁচাতে ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কবার্তা ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মাঝে প্রচারে সিপিপি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা থেকে মানুষের জানমাল রক্ষার্থে মাটির কিল্লা নির্মাণ করা হয়, যা সর্ব সাধারণের কাছে 'মুজিব কিল্লা' নামে পরিচিত। বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথে অগ্রসর হয়েই বাংলাদেশ আজ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় 'বিশ্বে রোল মডেল' হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।

বাংলাদেশের জলবায়ু কর্মকাণ্ডের প্রতি যুক্তরাজ্যের সমর্থন

ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোমিনিক রাব ৬ই সেপ্টেম্বর কপ-২৬ পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে বাংলাদেশ যে পদক্ষেপ নিয়েছে তার প্রতি যুক্তরাজ্যের সমর্থনের কথা পুনর্ব্যক্ত করেছেন। রাব ইউরোপে অবস্থানরত বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় এ কথা বলেন। ঢাকায় প্রাপ্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দুই নেতা বৈঠকে বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে দৃঢ় সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেন। বৈঠকে রাব কয়লা থেকে বাংলাদেশের পরিচ্ছন্ন ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তরে ব্রিটেনের সহায়তার আশ্বাস দেন।

জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্তদের গৃহনির্মাণ করবে সরকার

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিবিধ ঝুঁকি মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান বাংলাদেশ সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে। পৃথিবীর প্রথম দেশ হিসেবে গঠিত জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে এযাবৎ তিন হাজার ৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮০০টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ সকল প্রকল্পের মাধ্যমে শুধু উপকূলীয় এলাকারই প্রায় তিন কোটি মানুষ উপকৃত হয়েছে। তিনি বলেন, ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে গৃহহীনদের জন্য অধিক হারে গৃহনির্মাণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে সরকার। পরিবেশমন্ত্রী ১৪ই সেপ্টেম্বর মহাখালীর পুরাতন বন ভবনে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। পরিবেশমন্ত্রী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট যাতে স্বাবলম্বীভাবে কাজ করতে পারে সেজন্য আইন সংশোধন, মাঠ পর্যায়ে অফিস স্থাপন এবং পর্যাপ্ত সংখ্যক জনবল নিয়োগসহ প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রতিবেদন : সানজিদা আহমেদ

বিদ্যুৎ: বিশেষ প্রতিবেদন

শতভাগ বিদ্যুতায়নের আওতায়

বর্তমানে সাড়ে ৯৯ ভাগের বেশি জনগণ শতভাগ বিদ্যুতায়নের আওতায় এসেছে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ। তিনি বলেন, দেশের ৪৬১টি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের কিছু দুর্গম অফগ্রিড এলাকা ছাড়া মুজিববর্ষে গ্রিড-অফগ্রিড নির্বিশেষে শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম নিবিড় তদারকির মাধ্যমে বাস্তবায়ন হচ্ছে। স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে ১লা সেপ্টেম্বর সংসদ অধিবেশন টেবিলে উত্থাপিত প্রশ্নোত্তর পর্বে সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য মমতা হেনা লাভলীর প্রশ্নের লিখিত জবাবে

প্রতিমন্ত্রী আরও জানান, চলমান শতভাগ বিদ্যুতায়নের কার্যক্রমের কারণে আবাসিক খাতে বিদ্যুতের ব্যবহার বেড়েছে। সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম ও ইকোনমিক জোনগুলো পর্যায়ক্রমে চালু হলে শিল্প খাতেও বিদ্যুতের ব্যবহার পর্যায়ক্রমে বাড়বে।

মহেশখালীতে চারশো কোটি টাকার বিদ্যুৎ হাব

কক্সবাজার থেকে সংযুক্ত সড়কের মাধ্যমে মাত্র তিন ঘণ্টার পথ মহেশখালীতে চলছে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিভাগের উন্নয়নযজ্ঞ। মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে ঘিরে ৩১টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে শুধু বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি বিভাগেরই। এছাড়া সরকারের অন্যান্য পাঁচ মন্ত্রণালয় থেকে এখানে বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে আরও ৬৮টি প্রকল্প। এসব প্রকল্পে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিভাগের পক্ষ থেকে খরচ ধরা হয়েছে চারশো কোটি টাকা। সব প্রকল্প মিলিয়ে এক হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ হবে এই মহেশখালীতে। বিশ্বের অন্যতম রোল মডেল হিসেবে দ্বীপটিকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে কাজ হচ্ছে বলে সংবাদ মাধ্যমকে ১৩ই সেপ্টেম্বর জানিয়েছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ।

প্রতিবেদন : রিপা আহমেদ

নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

ছয় লেনে উন্নীত হচ্ছে তালাইমারি-কাটাখালী সড়ক

ছয় লেনে উন্নীত হচ্ছে তালাইমারী-কাটাখালী সড়ক। রাজশাহী মহানগরীর সমন্বিত নগর অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় তালাইমারি মোড় থেকে কাটাখালী বাজার পর্যন্ত অযান্ত্রিক যানবাহনের লেনসহ ছয় লেন সড়ক নির্মাণকাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন সিটি মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন। নগরীর চৌদ্দপা এলাকায় ফলক উন্মোচনের মাধ্যমে নির্মাণকাজের উদ্‌বোধন করেন সিটি মেয়র। বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে রাজশাহী সিটি করপোরেশন।

সিটি করপোরেশন সূত্র জানায়, তালাইমারি মোড় থেকে কাটাখালী বাজার পর্যন্ত অযান্ত্রিক যানবাহন লেনসহ ছয় লেন সড়ক নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে। এমন সড়ক রাজশাহীতে এটাই প্রথম। নাগরিকদের চলাচল নির্বিঘ্ন করতে রাজশাহী মহানগরীর গুরুত্বপূর্ণ

সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের ২২শে অক্টোবর রাজধানীর সড়ক ভবন অডিটোরিয়ামে 'জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস ২০২১' উপলক্ষে আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

সড়কগুলো প্রশস্ত করা হয়েছে। মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন বলেন, শুধু মহাসড়ক নয়, নগরীর ৩০টি ওয়ার্ডের পাড়ায়-মহল্লায় অলিগলির বিভিন্ন রাস্তা নির্মাণ করা হচ্ছে, যাতে বাড়ি থেকে বের হয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে মহাসড়কে উঠতে পারেন নাগরিকরা। এছাড়া নগরীতে আরও পাঁচটি ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হবে, যার নকশা তৈরিসহ অন্যান্য কাজ চলমান আছে। সড়কগুলোতে দৃষ্টিনন্দন সড়কবাতি স্থাপন করা হবে।

প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, চার দশমিক ১০ কিলোমিটার সড়কটি নির্মাণে ব্যয় হবে ৯৩ কোটি ৪৮ লাখ টাকা। সড়কের মাঝে থাকবে দুই মিটারের ডিভাইডার। ডিভাইডারের দুই পাশে ১০ দশমিক পাঁচ মিটারের সড়ক থাকবে। সড়কের উভয় পাশে তিন মিটার অযান্ত্রিক যানবাহন চলাচলের লেন ও উভয় পার্শ্বে তিন মিটার ফুটপাথ ও ড্রেন স্থাপন করা হবে। সড়কটির সৌন্দর্য বর্ধনে ডিভাইডার ও সড়কের উভয় পাশে বৃক্ষরোপণ করা হবে। সড়কটির কাজ শেষ হলে এটি হবে বিশ্বমানের একটি সড়ক।

জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস পালিত

২২শে অক্টোবর জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস পালিত হয়। সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগের উদ্যোগে সারা দেশে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে এ বছর পঞ্চমবারের মতো দিবসটি পালিত হয়েছে। উক্ত কর্মসূচি পালনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) কর্তৃক সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত সচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা হয়েছে। এবারে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে– 'গতিসীমা মেনে চলি, সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করি'।

প্রতিবেদন : মো. সৈয়দ হোসেন

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

করোনা শনাক্তের হার দুই শতাংশের নিচে

এক মাসের বেশি সময় ধরে দেশে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে। এর মধ্যে টানা এক সপ্তাহ ধরে নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে করোনা রোগী শনাক্ত দুই শতাংশের নিচে। ২৬শে অক্টোবর স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে মোট ১৯ হাজার ১৮৪ জনের নমুনা পরীক্ষায় ২৭৬ জনের সংক্রমণ শনাক্ত হয়। পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ছিল ১.৪৪ শতাংশ। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ২২শে সেপ্টেম্বর রোগী শনাক্ত ৫ শতাংশের নিচে নেমে আসে। এর মধ্যে সর্বশেষ সাতদিন ধরে রোগী শনাক্ত ২ শতাংশের নিচে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্ধারণ করা মানদণ্ড অনুযায়ী, কোনো দেশে টানা দুই সপ্তাহের বেশি সময় রোগী ৫ শতাংশের নিচে থাকলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে বলে ধরা যায়।

দুই কোটির বেশি মানুষ দুই ডোজ টিকা পেয়েছেন

দেশের দুই কোটি দুই লাখের বেশি মানুষ পূর্ণ দুই ডোজ করে করোনার টিকা পেয়েছেন। এ নিয়ে ১২ শতাংশ মানুষ পূর্ণ দুই ডোজ টিকার আওতায় এসেছেন। ২৩শে অক্টোবর সারা দেশে ৩

লাখ ৩৫ হাজার ১০৬ জনকে প্রথম ডোজ এবং ২ লাখ ৭০ হাজার ৩৯ জনকে দ্বিতীয় ডোজ টিকা দেওয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী, ২৩শে অক্টোবর পর্যন্ত প্রথম ডোজ পেয়েছেন তিন কোটি ৯৮ লাখ ৮৯ হাজার ২৬৮ জন। এর মধ্যে দ্বিতীয় ডোজ পেয়েছেন ২ কোটি ২ লাখ ৬৪ হাজার ৫১৩ জন। সরকার ৮০ শতাংশ মানুষকে পূর্ণ দুই ডোজ টিকা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছে। দেশে এখন অ্যাস্ট্রোজেনেকা, ফাইজার, সিনোফার্ম ও মর্ডানা– এই চার ধরনের টিকা দেওয়া হয়েছে।

পরীক্ষামূলকভাবে টিকা পেল ১১২ জন স্কুল শিক্ষার্থী

দেশে ১২ থেকে ১৭ বছর বয়সি শিশুদের পরীক্ষামূলকভাবে করোনাভাইরাসের টিকা দেওয়া শুরু হয়েছে। ১৪ই অক্টোবর মানিকগঞ্জের চারটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১১২ শিক্ষার্থীকে টিকা দেওয়া হয়। মানিকগঞ্জের কর্নেল মালেক মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এই টিকাদান কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী জাহিদ মালেক।

পরীক্ষামূলকভাবে মানিকগঞ্জ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের ৫০ জন শিক্ষার্থী, মানিকগঞ্জ এসকে সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৫০ জন, সদর উপজেলার গড়পাড়ার জাহিদ মালেক উচ্চ বিদ্যালয়ের ১০ জন শিক্ষার্থী এবং আটি গ্রামের জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান উচ্চ বিদ্যালয়ের ১০ জন শিক্ষার্থীকে টিকা দেওয়ার কথা থাকলেও টিকা নিয়েছে ১১২ জন শিক্ষার্থী। টিকা নেওয়ার পর শিশুদের কারোর কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। শিশুদের ফাইজারের টিকা দেওয়া হয়েছে। ফাইজারের টিকা যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের অন্য দেশেও শিশুদের দেওয়া হচ্ছে।

প্রতিবেদন : মো. আশরাফ উদ্দিন

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

দেশের সব রেললাইন ব্রডগেজে রূপান্তর

সরকার সারা দেশের সব রেললাইন ব্রডগেজে রূপান্তর করবে বলে জানিয়েছেন রেলমন্ত্রী নূরুল ইসলাম সুজন। তিনি বলেন, আমরা মিটারগেজ রেললাইন পরিবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছি। সারা দেশের সব রেললাইন ব্রডগেজে রূপান্তর করব। তখন ১২০-১৩০ কিলোমিটার গতিতে ব্রডগেজে ট্রেন চলবে। জয়দেবপুর থেকে ময়মনসিংহ হয়ে জামালপুর পর্যন্ত আরেকটি ব্রডগেজ রেললাইন নির্মাণ করা হবে বলেও জানান রেলমন্ত্রী। ২১শে অক্টোবর ময়মনসিংহের গফরগাঁও রেল স্টেশনে যাত্রী সুবিধা বাড়াতে প্ল্যাটফরম উঁচুকরণ, স্টেশন ভবন সংস্কার, এক্সেস কন্ট্রোল এবং প্ল্যাটফরম শেড নির্মাণকাজের উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা জানান।

রেলমন্ত্রী বলেন, গফরগাঁও রেল স্টেশনে বিদ্যমান রেললাইনের পাশেই ব্রডগেজ লাইন স্থাপন হবে। ব্রডগেজের জন্য জায়গা অনেকটা বেশি লাগে। এ লাইন স্থাপনের পর গফরগাঁও রেল স্টেশনে একটি ফুটওভার ব্রিজ করা হবে। যাতে মানুষ নিরাপদে চলাচল করতে পারে। এছাড়া বিদ্যমান রেল স্টেশনের প্ল্যাটফরম উঁচু করাসহ আরেকটি শেড করা হবে। তখন দুদিক থেকেই যাত্রীরা ট্রেনে উঠতে পারবে। তখন বয়স্ক, শিশুদের প্ল্যাটফরম থেকে ট্রেনে উঠতে কোনো কষ্ট হবে না।

নতুন ৩৭টি সেতুর উদ্‌বোধন

সড়ক, পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের ২১শে অক্টোবর ভার্চুয়ালি 'ওয়েস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রিজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট'-এর আওতায় নবনির্মিত ৩৫টি সেতু এবং রংপুর সড়ক জোনের আওতায় জিওবি অর্থায়নে নির্মিত দুটি সেতুসহ মোট ৩৭টি সেতুর উদ্‌বোধন করেন।

উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী জানান, ওয়েস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রিজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-এর আওতায় প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ৮২টি সেতু নির্মাণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। এ পর্যন্ত ৬১টি সেতুর নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে ২৫টি সেতু আগেই উদ্‌বোধন করা হয়েছে। ২১শে অক্টোবর ৩৫টি সেতু উদ্‌বোধন করা হয়। যার মধ্যে রংপুর সড়ক জোনের আওতায় প্যাকেজ-১-এর অধীনে প্রায় ৫৯৩ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ১৯টি সেতু এবং রাজশাহী সড়ক জোনের আওতায় প্যাকেজ-২-এর অধীনে প্রায় ৩৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ১৬টি সেতু রয়েছে। অবশিষ্ট ২২টি সেতুর কাজ চলমান। এছাড়াও রংপুর সড়ক জোনের আওতায় জিওবি অর্থায়নে নির্মিত দুটি সেতু বুড়িতিস্তা ও শান্তিপুর-ললতই-ভাটা সেতুরও শুভ উদ্‌বোধন করা হয়।

তিনি আরও জানান, সেতুগুলো দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে সড়ক নেটওয়ার্ক স্থাপন এবং সাসেক করিডোর, এশিয়ান হাইওয়ে, বিমসটেক ও সার্ক হাইওয়ের সাথে সংযুক্তি ঘটাতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। এছাড়াও উত্তরাঞ্চলের সাথে ঢাকাসহ সারা দেশের নিরাপদ, উন্নত ও ব্যয় সাশ্রয়ী যোগাযোগ স্থাপনসহ দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে রূপান্তরের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

প্রতিবেদন : জাহিদ হোসেন নিপু

কর্মসংস্থান: বিশেষ প্রতিবেদন

কালিয়াকৈরে 'সেন্টার অব এক্সেলেন্স ফর সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি' স্থাপন

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিকে দিয়েছেন রাজনৈতিক মুক্তি, আর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্নয়নের পাশাপাশি জাতিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। প্রতিটি সেক্টরে এভাবে অগ্রগতি অব্যাহত থাকলে ২০৪১ সালের আগেই বাংলাদেশ উন্নত দেশে পরিণত হবে। ১২ই অক্টোবর গাজীপুরের কালিয়াকৈরে বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন 'এক্সপোর্ট কম্পিটিটিভনেস ফর জবস' প্রকল্পের আওতায় 'সেন্টার অব এক্সেলেন্স ফর সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী তার বক্তৃতায় বাংলাদেশের পণ্যের ডিজাইন

এবং গুণমান বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রযুক্তিগত সহায়তা পেলে গার্মেন্টস শিল্পের মতো চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, জুতা, প্লাস্টিক এবং লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাত থেকেও প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। সে লক্ষ্যেই সেন্টার অব এক্সেলেন্স ফর সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি স্থাপন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, উচ্চমাত্রার প্রবৃদ্ধি, টেকসই উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে 'এক্সপোর্ট কম্পিটিটিভনেস ফর জবস' শীর্ষক ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও পণ্যের গুণগত মানোন্নয়ন করা। এ লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রামে ১টি, গাজীপুরে ২টি ও মুন্সিগঞ্জে ১টি অত্যাধুনিক টেকনোলজি সেন্টার স্থাপন করা হবে। বিশ্বমানের এই টেকনোলজি সেন্টারে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, জুতা, প্লাস্টিক এবং লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাতের শিল্পসমূহের জন্য টেকসই প্রযুক্তিগত সেবা প্রদান করা হবে।

কারিগরি শিক্ষকদের দক্ষতা লেভেল ৬-এ উন্নীত করার পরিকল্পনা

২০২৩ সালের মধ্যে দেশের কারিগরি শিক্ষা ধারার সকল শিক্ষকের দক্ষতা লেভেল ৬-এ উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সরকার। এজন্য ধারাবাহিকভাবে মানসম্পন্ন শিক্ষক প্রশিক্ষণের আয়োজন করে যাচ্ছে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ। ১৩ই অক্টোবর ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে দেশের বিভিন্ন পলিটেকনিক ও টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজসমূহের শিক্ষকদের জন্য আয়োজিত দুই মাসব্যাপী দক্ষতাভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে এ পরিকল্পনার কথা জানান কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মো. আমিনুল ইসলাম খান।

২২শে আগস্ট থেকে ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এবং ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে একযোগে শুরু হওয়া দ্বিতীয় ব্যাচের এ প্রশিক্ষণে মোট ১৬১ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ নেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. হেলাল উদ্দিন।

রংপুর সুগার মিল চালুর জন্য কর্মপরিকল্পনা

শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি) কর্তৃপক্ষ ও রংপুর সুগার মিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে কস্ট-বেনিফিট অ্যানালাইসিসসহ বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং তা উত্তরণে বাস্তবসম্মত করণীয় উল্লেখপূর্বক সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা জরুরিভিত্তিতে দাখিলের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। ২০শে অক্টোবর শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিএসএফআইসি'র আওতাধীন গাইবান্ধা জেলায় অবস্থিত রংপুর সুগার মিল পরিদর্শন শেষে মিলের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি সংশ্লিষ্টদের এ নির্দেশনা প্রদান করেন। এ বছরে রংপুর সুগার মিলজোন এলাকায় উৎপাদিত আখ সুষ্ঠুভাবে নিকটবর্তী জয়পুরহাট সুগার মিলে মাড়াইয়ের লক্ষ্যে করণীয় নির্ধারণের জন্য এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

প্রতিবেদন: ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

শেখ রাসেল দিবস ২০২১

নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠপুত্র ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছোটো ভাই শহিদ শেখ রাসেলের ৫৮তম জন্মদিন উদ্‌যাপিত হয়। এবারই প্রথম জাতীয়ভাবে দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়। এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'শেখ রাসেল: দীপ্ত জয়োল্লাস অদম্য আত্মবিশ্বাস'। দিবসটি উপলক্ষে সরকারিভাবে নানা আয়োজনের পাশাপাশি রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক

'শেখ রাসেল দিবস ২০২১' উপলক্ষে ১৮ই অক্টোবর ২০২১ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে শিশু-কিশোরদের পরিবেশনায় আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা– পিআইডি

সংগঠনগুলোও নানা কর্মসূচি পালন করে। তাদের কর্মসূচির মধ্যে ছিল– শেখ রাসেলসহ ১৫ই আগস্টে নিহতদের কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ, ফাতেহা পাঠ, মিলাদ, দোয়া মাহফিল, স্মারক ডাকটিকিট, উদ্‌বোধনী খাম ও সিলমোহর অবমুক্তকরণ, সেমিনার, কনসার্ট ফর পিস অ্যান্ড জাস্টিস, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ এবং কেক কাটার আয়োজন। এছাড়াও 'শেখ রাসেল দিবস ২০২১' উপলক্ষে ১৮ই অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন এবং তিনি শেখ রাসেল স্বর্ণপদকসহ অন্য প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

শামসুর রাহমানের জন্মোৎসব

আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম প্রধান কবি শামসুর রাহমান। ২৩শে অক্টোবর পালিত হয় এই মহান কবির ৯৩তম জন্মদিন। ১৯২৯ সালের এই দিনে পুরান ঢাকার মাহুতটুলিতে জন্মগ্রহণ করেন কবিতার এই বরপুত্র। তিনি সারা জীবন গেয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা আর অসাম্প্রদায়িকতার জয়গান। মৌলবাদ ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে নিয়েছেন সুদৃঢ় অবস্থান। কেবল কবিতা নয়, তিনি বাংলা ভাষাকেও সমৃদ্ধ করেছেন।

শামসুর রাহমানের জন্মদিন উদ্‌যাপন উপলক্ষে একক বক্তৃতানুষ্ঠানের আয়োজন করে বাংলা একাডেমি। একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে ২৩শে অক্টোবর এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রদান করেন বিশিষ্ট গবেষক ও কবি অধ্যাপক খালিদ হোসাইন। স্বাগত বক্তব্য দেন বাংলা

একাডেমির সচিব এ এইচ এম লোকমান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা।

প্রতিবেদন : তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র *চিরঞ্জীব মুজিব*-এর টিজার উদ্‌বোধন

সচিবালয়ে ১৮ই অক্টোবর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* অবলম্বনে নির্মিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর ছোটোবোন শেখ রেহানা নিবেদিত পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র *চিরঞ্জীব মুজিব*-এর টিজার উদ্‌বোধন করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাসান মাহমুদ। উদ্‌বোধনকালে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. ফারুক আহমেদ, চলচ্চিত্রটির পরিচালক ও সংলাপ রচয়িতা নজরুল ইসলাম, সৃজনশীল পরিচালক জুয়েল মাহমুদ ও প্রযোজক লিটন হায়দার উপস্থিত ছিলেন।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ১৮ই অক্টোবর ২০২১ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'চিরঞ্জীব মুজিব'-এর টিজার উদ্‌বোধন করেন– পিআইডি

মন্ত্রী *চিরঞ্জীব মুজিব* চলচ্চিত্র নির্মাণে সময় দেবার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং অন্য ভাষাভাষীসহ কোটি কোটি মানুষ গ্রন্থটি পড়েছে। কিন্তু এটি নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়নি। এই চলচ্চিত্রের জন্য বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

চিরঞ্জীব মুজিব চলচ্চিত্রে বঙ্গবন্ধুর চরিত্রে অভিনয় করেছেন আহমেদ রুবেল। বেগম ফজিলাতুন নেছা রেণুর চরিত্র রূপায়ন করেছেন পূর্ণিমা এবং বঙ্গবন্ধুর বাবা ও মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন– খায়রুল আলম সবুজ এবং দিলারা জামান।

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে ভিন্ন ধারার ছবিই সেরা

নব্বই দশকের শুরু থেকেই জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে ভিন্ন ধারার মৌলিক গল্পের ছবিই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে আসছে। চলচ্চিত্র বোদ্ধাদের মতে, সময়ের পথে হেঁটে নতুনদের কাঁধে ভর করে এ বদলের হাওয়া লেগেছে। দর্শক দৃষ্টি আকর্ষণ, জাতীয় পুরস্কার অর্জন ও আন্তর্জাতিক উৎসবে প্রশংসা এবং সম্মাননায় এগিয়ে যাচ্ছে ভিন্ন ধারার ছবি। নব্বই দশকের শুরু থেকে আরম্ভ হওয়া এই চিত্র এখনও অব্যাহত আছে। ১৯৯২ সালে নতুন ধারার গল্পের ছবি *শঙ্খনীল কারাগার* জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে সেরা ছবির মর্যাদা লাভ করে। এরপর থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত জাতীয় পুরস্কারে সেরা ছবি ও বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভিন্ন ধারার গল্পের ছবিই সেরার মর্যাদা পেয়ে আসছে।

বাংলাদেশের ছবি নিয়ে ভারতে দুই উৎসব

বাংলাদেশের ছবি নিয়ে ভারতে অনুষ্ঠিত হয়েছে দুটি উৎসব। ২১ থেকে ২৩শে অক্টোবর আগরতলায় 'দ্বিতীয় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব', ২৩ থেকে ২৮শে অক্টোবর গুয়াহাটিতে 'প্রথম বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠেয় এ উৎসবে প্রদর্শনীর জন্য প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশের ৩৫টি চলচ্চিত্র বাছাই করা হয়। এসব ছবি থেকে যাচাই-বাছাই করে আরেকটি সংক্ষিপ্ত তালিকা করা হয়। মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, দুই উৎসবের জন্য প্রাথমিকভাবে বাছাই করা ৩৫টি চলচ্চিত্র হলো– *হাসিনা আ ডটার'স টেল, ছুঁয়ে দিলে মন, জালালের গল্প, অমি ও আইসক্রিমঅলা, অনিল বাগচীর একদিন, যদি একদিন, জিরো ডিগ্রী, বাপজানের বায়োস্কোপ, আয়নাবাজি, কৃষ্ণপক্ষ, তুখোড়, ভুবন মাঝি, সত্বা, রাজনীতি, ঢাকা অ্যাটাক, হালদা, অন্তর জ্বালা, আঁখি ও তার বন্ধুরা, গহীন বালুচর, পুত্র, পোড়ামন ২, দেবী, জান্নাত, ফাগুন হাওয়ায়, কালো মেঘের ভেলা, মনের মত মানুষ পাইলাম না, আবার বসন্ত, মায়া : দ্য লস্ট মাদার, গডি, ন ডরাই, বিশ্বসুন্দরী, গোর, গেরিলা* প্রমুখ।

সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র *চন্দ্রাবতীর কথা*

সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র *চন্দ্রাবতীর কথা*। এটি পরিচালনা করেছেন এন রাশেদ চৌধুরী। সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত ম্যানগ্রোভ পিকচারস ও বেঙ্গল ক্রিয়েন্সের প্রযোজনায় *চন্দ্রাবতী কথার* কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন মডেল ও অভিনেত্রী দোয়েল ম্যাশ এবং চন্দ্রাবতীর প্রেমিক জয়ানন্দের চরিত্রে অভিনয় করেছেন ইমতিয়াজ বর্ষণ। এছাড়া আরও অভিনয় করেছেন– নওশাবা আহমেদ, জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, মিতা রহমান, গাজী রাকায়েত, আরমান পারভেজ মুরাদ, জয়িতা মহলানবিশ প্রমুখ। এটি নির্মিত হয়েছে বসুন্ধরা এলপি গ্যাস লিমিটেড-এর নিবেদনে এবং জাজ মাল্টিমিডিয়ার পরিবেশনায়। এদিকে ১২ই অক্টোবর জাঁকজমকপূর্ণভাবে রাজধানীতে চলচ্চিত্রটির প্রিমিয়ার শো হয়।

প্রতিবেদন : মিতা খান

মাদক প্রতিরোধ : বিশেষ প্রতিবেদন

জুয়া-মাদকের ব্যাপকতা বন্ধে অভিযান

৭ই অক্টোবর কারওয়ান বাজার র‍্যাব মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে র‍্যাব-১১ অধিনায়ক লে. কর্নেল তানভীর মাহমুদ পাশা বলেন, দেশে জুয়ার ব্যাপকতা ও জুয়ার কারণে খুনের ঘটনা বাড়ছে। জুয়া ও মাদকের

ব্যাপকতা রোধে আমরা অভিযান পরিচালনা করছি। মুন্সিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জসহ দেশের প্রায় সব জায়গায় আমাদের অভিযান চলছে। আমরা বিভিন্ন সময় জুয়াখেলা অবস্থায় অনেকজনকে গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় নিয়ে এসেছি।

মাদকমুক্ত যুবসমাজ গড়ার লক্ষ্যে ম্যারাথন দৌড় অনুষ্ঠিত

'খেলাধুলায় বাড়ে বল, মাদক ছেড়ে খেলতে চল'– স্লোগানে মাদকমুক্ত যুবসমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভোলায় ম্যারাথন দৌড় অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ই অক্টোবর সকালে ভোলা সদর উপজেলার ভেদুরিয়া ইউনিয়নে ব্যাংকের হাট চত্বর থেকে ম্যারাথন দৌড় শুরু হয়ে ভোলা সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে এসে শেষ হয়। এতে বিভিন্ন বয়সি ১৫০ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়।

ভোলা জেলা পুলিশের আয়োজনে ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহযোগিতায় প্রতিযোগিতার উদ্‌বোধন করেন ভোলা-২ আসনের সংসদ সদস্য আলী আজম মুকুল ও বরিশাল রেঞ্জের ডিআইজি এস এম আক্তারুজ্জামান। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মো. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী।

প্রতিযোগিতায় ২৯ মিনিট সময় নিয়ে প্রথম স্থান অর্জন করেন নয়ন। ৩৪ মিনিট সময় নিয়ে দ্বিতীয় হন রাকিব এবং ৩৫ মিনিট সময় নিয়ে তৃতীয় হন তারেক। বিজয়ী পাঁচজনকে সম্মাননা উপহার দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মামুন আল ফারুক, ভোলা জেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম গোলদার, দৌলতখান উপজেলার চেয়ারম্যান মনজুরুল আলম খান, ভোলা প্রেস ক্লাব সভাপতি এম হাবিবুর রহমান প্রমুখ।

প্রতিবেদন : জান্নাত হোসেন

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী: বিশেষ প্রতিবেদন

বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি এদেশের অমূল্য সম্পদ

খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেন, বাংলাদেশের সমতলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি এদেশের অমূল্য সম্পদ। বিনোদনের পাশাপাশি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে এ অঞ্চলের মানুষের রয়েছে নাড়ির সম্পর্ক। ১৬ই অক্টোবর নিয়ামতপুর উপজেলার শিবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মজুমদার বাড়ি বারোয়ারি দুর্গাপূজা উদ্‌যাপন কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নৃত্য উৎসবে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দিক থেকে বাংলাদেশ এই অঞ্চলের রোল মডেল। বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে অসাম্প্রদায়িক নীতির ভিত্তিতে। দেশে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কোনোক্রমেই ভূলুণ্ঠিত হতে দেওয়া হবে না।

দেশের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির বিকাশ ও পৃষ্ঠপোষকতায় সরকার ইতোমধ্যে নানামুখী উদ্যোগ নিয়েছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, সাংস্কৃতির ঐতিহ্য রক্ষায় তৃণমূল পর্যায়ের এ ধরনের আয়োজন নিজস্ব কৃষ্টির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেন, এ অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি হারিয়ে না যায় তার জন্য 'ত্রিশূল' নামে একটি সংগঠন কাজ করছে। শুধু দেশের মধ্যে নয় দেশের বাইরেও এ ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে ত্রিশূলের নেতৃবৃন্দকে কর্মসূচি নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

কঠিন চীবর দানোৎসব

বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দানোত্তম কঠিন চীবর দানোৎসবে মুখর হয়ে ওঠে রাঙামাটি। বিহারে বিহারে অনুষ্ঠিত হয় দুই দিনব্যাপী এ ধর্মীয় উৎসব। পালিত হয় ধর্মীয় নানা আচার-অনুষ্ঠান। সদর উপজেলার বন্দুকভাঙা ইউনিয়নের যমচুগ বনাশ্রম ভাবনা কেন্দ্রে ৩৮তম কঠিন চীবর দানোৎসব ২৪শে অক্টোবর শুরু হয়ে শেষ হয় ২৫শে অক্টোবর সন্ধ্যায় প্রদীপ প্রজ্বলন ও ফানুস উড়িয়ে।

প্রতিবেদন : আসাব আহমেদ

শিশু ও কিশোর উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

স্কুল শিক্ষার্থীদের করোনা টিকাদান

বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া কারোনা মহামারিতে যে সকল শাখা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার মধ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা অন্যতম। শিক্ষার এই স্থবির অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য অনেক দেশ শিক্ষার্থীদের টিকা প্রদান করেছে। বাংলাদেশ সরকারও সেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এরই ফলশ্রুতিতে রাজধানীর স্কুল-কলেজগুলোর শিক্ষার্থীদের টিকা দেওয়ার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ১লা নভেম্বর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে শিক্ষার্থীদের টিকা প্রদানের মাধ্যমে এ কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করা হয়। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগ এর সমন্বয়ে রয়েছে। ২রা নভেম্বর থেকে প্রতিদিন রাজধানীর আটটি কেন্দ্রে প্রতিটিতে পাঁচ হাজার করে মোট ৪০ হাজার শিক্ষার্থীকে টিকা দেওয়া হবে। টিকাদান কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক ও শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। শিক্ষার্থীদের ফাইজার-বায়োএনটেকের টিকা দেওয়া হবে।

উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় ১২ থেকে ১৭ বছরের শিক্ষার্থীদের টিকা কার্যক্রম শুরু করতে পারলাম।

কিছুদিন আগে যাদের পরীক্ষামূলক এই টিকা দিয়েছি, তারা সুস্থ আছে। জানা গেছে, ফাইজার-বায়োএনটেকের ৭০ লাখের বেশি ডোজ টিকা পেয়েছে বাংলাদেশ। এ মাসে ফাইজারের আরও ৩৫ লাখ ডোজ টিকা দেশে আসবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক। টিকা প্রদানের আটটি কেন্দ্র হলো– বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার হার্ডকো স্কুল, মালিবাগের সাউথ পয়েন্ট স্কুল, গুলশানের চিটাগাং গ্রামার স্কুল, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মিরপুরের ঢাকা কমার্স কলেজ, ধানমন্ডির কাকলী স্কুল, উত্তরার সাউথব্রিজ স্কুল এবং মিরপুরের স্কলাস্টিকা স্কুল।

শিশুপল্লি প্লাস পরিদর্শন করেন ব্রিটিশ হাইকমিশনার

গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার টেংরা গ্রামের শিশুপল্লি প্লাস পরিদর্শন করে ব্রিটিশ হাইকমিশনার মিং চ্যাটার টন ডিকসন বলেন, শুধু মানবসেবা নয়, উন্নত মানবজাতি গঠনে শিশুপল্লি প্লাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। পরিবার থেকে হারিয়ে যাওয়া শিশু-কিশোরদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে ভূমিকা রাখছে এই শিশুপল্লি প্লাস, একইসঙ্গে অসহায় নারী ও মায়েদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে কারিগরি শিক্ষা প্রদানে অবদান রাখছে। আমি শিশুপল্লি প্লাসের কার্যক্রম দেখে খুশি হয়েছি। আমি শিশুপল্লি প্লাসকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করব। ৬ই নভেম্বর তিনি শিশুপল্লি প্লাস পরিদর্শন করে শিশুদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক কর্মসূচি উপভোগ করার সময় এসব কথা বলেন। এর আগে তিনি প্রতিষ্ঠানটির তাঁতশিল্প, তৈরি পোশাকশিল্প, হস্ত ও কুটিরশিল্প, হাতে ভাজা নিরাপদ মুড়ি তৈরি, সবজি উৎপাদন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। উল্লেখ্য, ১৯৮৯ সালে শিশুপল্লি যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে ৩২৪ জন শিশু-কিশোর ও ১৫৬ জন মা এ প্রতিষ্ঠানের সেবার আওতায় রয়েছেন।

প্রতিবেদন : নাসিমা খাতুন

প্রতিবন্ধী : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রতিবন্ধীরা দেশের বোঝা নয়, সম্পদ

সমাজকল্যাণমন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ বলেন, প্রতিবন্ধীরা দেশের বোঝা নয়, সম্পদ। প্রতিবন্ধীদের জন্য গৃহীত কর্মসূচিসমূহ সফলভাবে বাস্তবায়িত হওয়ার ফলে প্রতিবন্ধীরা দেশের সম্পদে পরিণত হতে চলছে। মন্ত্রী ১৫ই অক্টোবর রাজধানীর মিরপুরে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনে 'বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস ২০২১' উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাসভা এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সম্মাননা/অনুদান প্রদান ও স্মার্ট হোয়াইট ক্যান বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়ে এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ব্লাইন্ড এডুকেশন রিহেবিলিটেশন ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (বার্ডো)-এর নির্বাহী পরিচালক মো. সাইদুল হক।

মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কন্যা সায়মা ওয়াজেদ হোসেন প্রতিবন্ধীদের জন্য কাজ করে সারা বিশ্বকে আলোড়িত ও সুনাম অর্জন করেছেন। প্রতিবন্ধীদেরকে সম্পদে পরিণত করার জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রতিবন্ধীসহ পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল স্রোতোধারায় সম্পৃক্ত করার আহ্বান

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেন, প্রতিবন্ধীসহ সমাজের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল স্রোতোধারায় সম্পৃক্ত করতে হবে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় এই জনগোষ্ঠীর কল্যাণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অত্যন্ত সহানুভূতিশীল বলে তিনি উল্লেখ করেন। মন্ত্রী ২৩শে অক্টোবর ঢাকায় 'বিশ্ব সাদাছড়ি প্রতিরক্ষা দিবস ২০২১' উপলক্ষে রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে ভিজুয়ালি ইম্পেয়ার্ড পিপলস সোসাইটি আয়োজিত আলোচনাসভা ও সাদাছড়ি বিতরণ অনুষ্ঠানে অনলাইনে যুক্ত থেকে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেন, প্রতিবন্ধীদের জীবনে অসংখ্য চ্যালেঞ্জ আছে। এর মধ্যে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তর বিষয়ক তিনি তার ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের সফটওয়্যার উন্নয়নসহ তার অধীন ডাক অধিদপ্তর, বিটিসিএল, টেলিটকসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যে ধরনের সহায়তার সুযোগ

রাজধানীর মিরপুরে ১৫ই অক্টোবর জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন প্রাঙ্গণে 'বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস ২০২১'-এর উদবোধন করেন সমাজকল্যাণ সচিব মাহফুজা আখতার – পিআইডি

আছে তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হবে বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কেবল প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্যই নয়, সমাজের দুস্থ, অসহায় পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল।

এসময় অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধে সাদাছড়ি ব্যবহারকারীদের মুক্ত চলাচল নিশ্চিত করতে ১৫টি সুপারিশ পেশ করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল– দেশীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উন্নতমানের সাদাছড়ি তৈরি, নামমাত্র মূল্যে সাদাছড়ি ব্যবহারকারীদের মধ্যে তা বিতরণ, সাদাছড়ি ব্যবহারে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের উৎসাহিত করতে এবং এর ব্যবহার কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, ইমারত, রাস্তা, ফুটপাত, রেলওয়ে প্ল্যাটফরমসহ পাবলিক প্লেস দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের উপযোগী করে তৈরি করা, দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য ব্রেইল বই ও অন্যান্য মুদ্রণ ডাক মাশুল মুক্ত প্রেরণ করার সরকারি নির্দেশ সম্পর্কে ডাক অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের অবহিত করা, ডাকঘর সপ্তাহে প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ স্কিম চালু, মোবাইল অপারেটরসমূহে প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মক্ষেত্রে শতকরা একভাগ কোটা চালু, পিএবিএক্স-এর উপযোগী টকিং সফটওয়্যারের ব্যবস্থা করা।

যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের গ্লোবাল আইটি চ্যালেঞ্জ প্রোগ্রামে সাফল্য

যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা গ্লোবাল আইটি চ্যালেঞ্জ প্রোগ্রাম (GITC) ২০২১-এ বাংলাদেশ দল সাফল্য অর্জন করেছে। প্রোগ্রামটি ২০ থেকে ২১শে অক্টোবর অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ দলের মোট ১৯ জন নির্বাচিত প্রতিযোগী এতে অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের চার জন প্রতিযোগী নিম্নলিখিত চারটি ক্ষেত্রে বিজয়ী হয়ে পুরস্কার অর্জন করেন: বেস্ট অ্যাওয়ার্ড (১ম স্থান)-এ ই-লাইফ ম্যাপ ক্যাটাগরিতে বিজয়ী রইচ উদ্দিন মারুফ (শ্রবণ প্রতিবন্ধী), গুড অ্যাওয়ার্ড (৩য় স্থান)-এ ই-টুল এক্সেল ক্যাটাগরিতে বিজয়ী অমিত সুজাউদ্দিন তুরাগ (এনডিডি), ই-টুল এক্সেল ক্যাটাগরিতে বিজয়ী নিয়ামুর রশিদ শিহাব (শারীরিক প্রতিবন্ধী) ও ই-লাইফ ম্যাপ ক্যাটাগরিতে বিজয়ী মেহেদি হাসান (শারীরিক প্রতিবন্ধী)।

GITC-এর মূল আয়োজক প্রতিষ্ঠান Rehabilitation International (RI) Korea। GITC- 2021-এর আয়োজক দেশ ছিল মিয়ানমার। কিন্তু কোভিড-১৯-এর কারণে তা সরাসরি আয়োজন করা সম্ভব না হওয়ায় কোরিয়া থেকে অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রতিযোগিতার জন্য গত ১৭ই জুন অনুষ্ঠিত প্রিলিমিনারি রাউন্ডের মাধ্যমে বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। ঢাকা প্রধান কার্যালয়সহ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে এ প্রতিযোগিতায় মোট ২০ জন অংশগ্রহণ করে এবং ১৯ জন ফাইনাল রাউন্ডের জন্য নির্বাচিত হয়। প্রিলিমিনারি রাউন্ডে ১৩টি দেশের ৬০০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। ফাইনাল রাউন্ডে ১৩টি দেশের ৩৮৫ জন প্রতিযোগী চারটি ক্যাটাগরি (শারীরিক, দৃষ্টি, বাক ও শ্রবণ এবং এনডিডি) অনুসারে অংশগ্রহণ করেন। ফাইনাল রাউন্ডে চার ধরনের প্রতিযোগিতা অন্তর্ভুক্ত ছিল, যথাক্রমে: ই-টুল পিপিটি, ই-লাইফ ম্যাপ চ্যালেঞ্জ, ই-টুল এক্সেল, এবং ই-কনটেন্ট ও ই-ক্রিয়েটিভ।

প্রতিবেদন: অমিত কুমার

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রধানমন্ত্রীর সহয়তা পেলেন সাবেক ফুটবলার আজমত

বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক আজমত আলীর চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহের জন্য ১০ লাখ টাকার আর্থিক সহায়তা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ৪ঠা নভেম্বর সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মো. জাহিদ আহসান রাসেল আজমত আলীর কাছে চেক হস্তান্তর করেন।

ম্যাচসেরা ক্রিকেটারের তালিকায় সাকিব

অক্টোবর মাসের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচনের জন্য ৪ঠা নভেম্বর তিনজনের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ করেছে আইসিসি। দ্বিতীয়বারের মতো আইসিসির ম্যাচসেরা ক্রিকেটারের সংক্ষিপ্ত তালিকায় জায়গা পাওয়া তারই স্বীকৃতি। ছেলেদের বিভাগে টি-২০ বিশ্বকাপের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে সাকিবের সঙ্গে মনোনয়ন পেয়েছেন পাকিস্তানের আসিফ আলী ও নামিবিয়ার ডেভিড ভেসে। মেয়েদের সংক্ষিপ্ত তালিকায় জায়গা পেয়েছেন জিম্বাবুয়ের মেরি-অ্যান মুসন্দা এবং আয়ারল্যান্ডের লরা ডিলানি ও গ্যাবি লুইস।

বঙ্গবন্ধু জাতীয় সাঁতারে সেরা নৌবাহিনী

বঙ্গবন্ধু জাতীয় সাঁতারে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। ২৪শে অক্টোবর মিরপুর সৈয়দ নজরুল ইসলাম জাতীয় সুইমিং কমপ্লেক্সে তিনদিনের প্রতিযোগিতা শেষে ৩৮ স্বর্ণ, ২৩ রুপা ও আটটি ব্রোঞ্জ জিতে সেরা হয় তারা। পাঁচ স্বর্ণ, ১৮ রুপা ও ১৯

ব্রোঞ্জ জিতে রানার্সআপ হয় সেনাবাহিনী। শেষদিনে আরও পাঁচটি নতুন জাতীয় রেকর্ড হয়। এ নিয়ে তিনদিনে ১১টি নতুন রেকর্ড গড়লেন সাঁতারুরা। পুরুষ বিভাগে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কাজল মিয়া পাঁচ স্বর্ণ (তিনটি নতুন জাতীয় রেকর্ড) পেয়ে সেরা সাঁতারু নির্বাচিত হন। নারী বিভাগে বাংলাদেশ নৌবাহনীর সোনিয়া খাতুন তিন স্বর্ণ ও দুই রুপা পেয়ে হন সেরা সাঁতারু। খেলা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল।

প্রতিবেদন : মো. মামুন হোসেন

চলে গেলেন নাট্যব্যক্তিত্ব ড. ইনামুল হক

আফরোজা রুমা

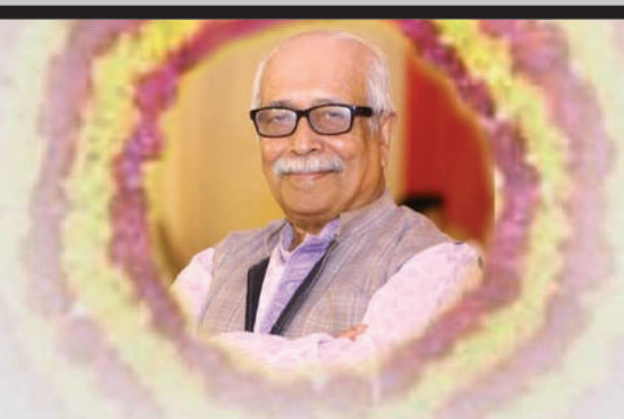

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) রসায়ন বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক, একুশে ও স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত নাট্যব্যক্তিত্ব ড. ইনামুল হক চলে গেলেন না ফেরার দেশে। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ১১ই অক্টোবর তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর সময় বিশিষ্ট এই নির্দেশকের বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।

১৯৪৩ সালের ২৯শে মে ফেনী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন ড. ইনামুল হক। তাঁর বাবার নাম ওবায়দুল হক, মায়ের নাম রাজিয়া খাতুন। ফেনী পাইলট উচ্চবিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক ও ঢাকার নটর ডেম কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাসের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি রসায়নে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৫ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) রসায়ন বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন ড. ইনামুল হক। ১৯৭০ সালে সহকারী অধ্যাপক, ১৯৭৯ সালে সহযোগী অধ্যাপক এবং ১৯৮৭ সালে অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। আর বুয়েট থেকেই কর্মজীবনের অবসর নেন। তিনি ছিলেন একাধারে নাট্যকার, অভিনেতা ও লেখক। দুর্দান্ত অভিনয়ের পাশাপাশি চমৎকার গল্পের নাটক লিখেছেন তিনি। ১৯৬৮ সালে তাঁর প্রথম লেখা নাটক 'অনেক দিনের একদিন' বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত হয়। ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াসে বিভিন্ন আন্দোলনমুখী নাটকে অংশগ্রহণ করেন ইনামুল হক। ১৯৭০ সালে সামরিক শাসন উপেক্ষা করে তৎকালীন অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে ট্রাকে করে ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে পথনাটক করেন।

নটর ডেম কলেজে পড়ার সময় ড. ইনামুল হক প্রথম মঞ্চনাটকে অভিনয় শুরু করেন। ফাদার গাঙ্গুলীর নির্দেশনায় তাঁর প্রথম নাটক 'ভাড়াটে চাই'। ১৯৬৮ সালে বুয়েট ক্যাম্পাসে নাগরিক নাট্যসম্প্রদায়ের শুরু। এ দলের হয়ে প্রথম তিনি মঞ্চে অভিনয় করেন আতাউর রহমানের নির্দেশনায় 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' নাটকে। এরপর 'দেওয়ান গাজীর কিসসা', 'নুরুলদীনের সারাজীবন'সহ আরও বহু নাটকে অভিনয় করেন। ১৯৯৫ সালে ড. ইনামুল হক নাগরিক নাট্যসম্প্রদায় থেকে বের হয়ে প্রতিষ্ঠা করেন নাগরিক নাট্যাঙ্গন। এ দলের হয়ে 'জনতার রঙ্গশালা', 'সরমা'সহ আরও বেশ কয়েকটি নাটকে অভিনয় করেন। ২০০০ সালে ড. ইনামুল হক প্রতিষ্ঠা করেন নাগরিক নাট্যাঙ্গন 'ইনস্টিটিউট অব ড্রামা' নামের আরেকটি প্রতিষ্ঠান। তাঁর অভিনীত প্রথম টিভি নাটক মুস্তাফা মনোয়ার পরিচালিত 'মুখরা রমণী বশীকরণ'। ইতোমধ্যে তাঁর ১৮টি নাটক বিভিন্ন নাট্যপত্রে, বিশেষ ম্যাগাজিনে এবং বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে। ইনামুল হকের উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে– *গৃহবাসী*, *মুক্তিযুদ্ধ নাটকসমগ্র*, *হ্যারল্ড পিন্টারের দুটি নাটক*, *মহাশূন্য অভিযান*, *পিতা*, *গৃহকোণ* ইত্যাদি। নাটকে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ২০১২ সালে তিনি একুশে পদক, ২০১২ সালে টেলিভিশন রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ আজীবন সম্মাননা এবং ২০১৭ সালে স্বাধীনতা পুরস্কার অর্জন করেন।

গুণী নাট্যজন ইনামুল হকের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শোকবার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, নাট্যাঙ্গনে ইনামুল হকের অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রধানমন্ত্রী মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। পৃথক শোকবার্তা দিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ।

এছাড়া সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী, গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন, থিয়েটার পত্রিকা *ক্ষ্যাপা*, নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়, আরণ্যক, ঢাকা থিয়েটার, বটতলা, সুবচন নাট্য সংসদ, অনুস্বর, অভিনয় শিল্পী সংঘ, টেলিভিশন নাট্যকার সংঘ, চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতি, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান ইনামুল হকের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে।

১২ই অক্টোবর সকাল সাড়ে ১০টায় কেন্দ্রীয় শহিদমিনারে সর্বস্তরের জনসাধারণের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য তাঁর মরদেহ রাখা হয়। পরে দুপুর ১২টায় বুয়েট খেলার মাঠে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা শেষে বনানী কবরস্থানে তাঁর মরদেহ দাফন করা হয়। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 42, No. 06, November 2021, Tk. 25.00

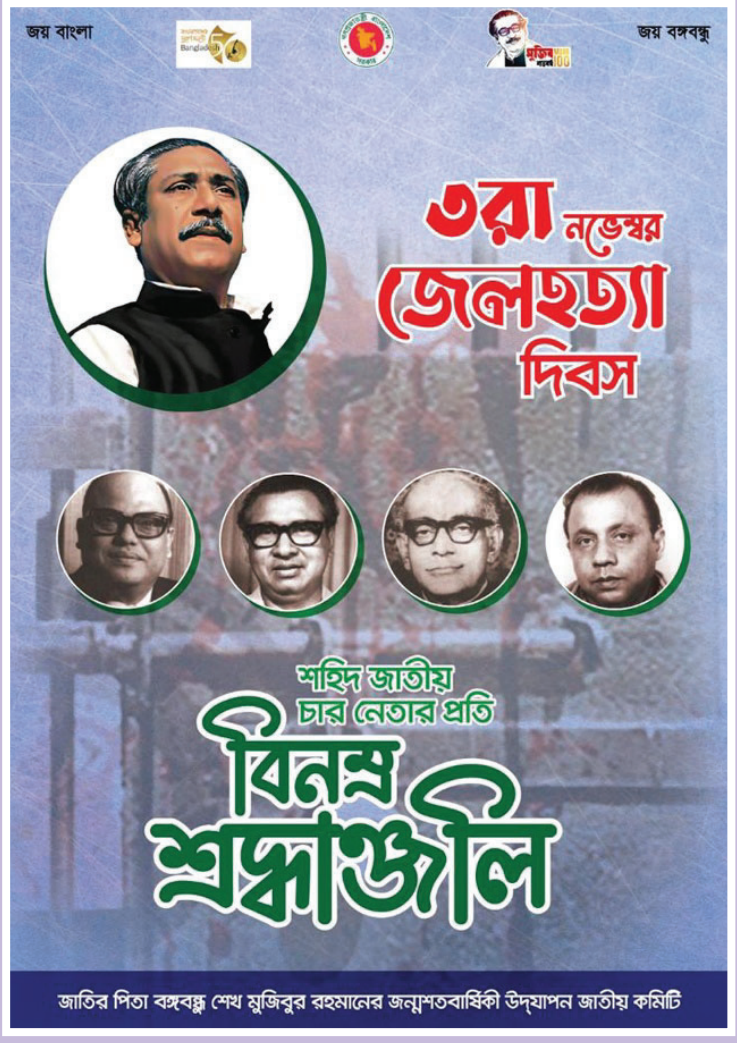

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd